আমাদের জয়িতারা

SKS

উপদেষ্টা
রাসেল আহম্মেদ লিটন

সম্পাদনা
যোসেফ হালদার

সম্পাদনা সহযোগী
সাহা দীপক কুমার
মোঃ আশরাফুল আলম
মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রদীপ রায়

প্রকাশনায়
এসকেএস ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২৩

স্বত্ব
এসকেএস ফাউন্ডেশন
কলেজ রোড, উত্তর হরিণ সিংহা,
গাইবান্ধা-৫৭০০

ডিজাইন
রোকনুজ্জামান রোকন

মুদ্রণ
এসকেএস প্রিন্টার্স, গাইবান্ধা

আমাদের জয়িতারা

এসকেএস ফাউন্ডেশন

সূচি

অর্থনৈতিক সফলতায় লড়াকু সাহানার জয়িতা জয়	০৬
পল্লীবধু শান্তনা রাণীর সংগ্রামী গল্প	০৮
নতুন উদ্যমে জোবেদার জীবন শুরু	১০
দারিদ্র্য ডিঙিয়ে লুৎফা বেগমের জয়িতা অর্জন	১২
সংগ্রামী কাজলের বদলে যাওয়া জীবন	১৪
নির্যাতনের প্রতিবাদেই সেলিনার উন্নয়নযাত্রা শুরু	১৬
সমাজ সচেতন সালেকা এখন জয়িতা	১৮
রত্নগর্ভা মৌসুমীর জয়িতা সম্মাননা অর্জন	২০
সমাজ উন্নয়নে অবদান রেখে লাভলী বেগম জয়িতা	২২
সচেতনতাই মিনারার সাফল্যের সূচনা	২৪
সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদানে ফাতেমার জয়িতা জয়	২৬
অর্থনৈতিক সফলতায় শাপলা বেগমের জয়িতা অর্জন	২৮
নির্যাতনের বিভীষিকা দূরে ঠেলে বেলী এখন স্বভাব নেতা	৩০
সংগ্রামী আসমা পেলেন জয়িতা সম্মাননা	৩৩
অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী মোসলেমার জয়িতা স্বীকৃতি	৩৬
শত প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে ইয়ারন এখন জয়িতা	৩৮
সমাজ উন্নয়নে জয়িতা সম্মানে ভূষিত ঝর্ণা বেগম	৪০
নির্যাতন প্রতিরোধে বিজয়ী অজিফা বেগম	৪২
সমাজ উন্নয়নে রোজিনার ভূমিকা অসামান্য	৪৫
নতুন উদ্যমে শুরু মঞ্জুয়ারার জীবন	৪৭
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতেই লিপি জয়িতা	৪৯
নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে স্বাবলম্বী রুপালী জয়িতা	৫১
নতুন উদ্যমে শুরু শাহিনুরের জীবন	৫৪
সালেহার স্বপ্নপূরণ	৫৬
নতুন জীবনে কোহিনুর বেগম	৫৮
অর্থনৈতিক সাফল্যে বুলবুলি বেগম জয়িতা	৬০
সমাজ উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতি পেলেন লাইলী	৬২

ভূমিকা

উপকূলীয় ঝড়ঝঞ্জার দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ। নদীর উজানে বন্যা, খরা, নদীভাঙনের মতো বৈরী আবহাওয়াও দেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষের বড় ভোগান্তি। বন্যা ও নদীভাঙনের ফলে অসংখ্য ঘরবাড়ি ও হাজার হাজার একর ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় প্রতি বছর। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষিজমির উৎপাদন ব্যাহত হয়। কাজের অভাবে বেকার হয় মানুষ। অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মারাত্মকভাবে। ব্যাপক মানুষ হয়ে পড়ে নিঃস্ব।

উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ জেলার মানুষের দারিদ্র্য ছিল চরমে। দারিদ্র্যের কারণে এ অঞ্চলের কৃষি শ্রমিক ও বেকার জনগোষ্ঠী কাজের খোঁজে চলে যেত বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো পরিবারের সাথে। অন্যদিকে ভঙ্গুর রাস্তাঘাট ও চরাঞ্চলের মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা নাজুক হওয়ায় সামান্য পরিমাণ ফসলও বাজারজাত করার সুযোগ ছিল না। এভাবে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়েছে এ অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষগুলো। অর্থনৈতিক এ দৈনতা উত্তরাঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের উপর বিস্তার করেছে নেতিবাচক প্রভাব। শিক্ষার অভাব, ধর্মীয় কুসংস্কার, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও নারী বৈষম্য প্রভৃতি বাসা বেঁধেছে এ অঞ্চলে। অর্থনৈতিক কাজেও নারীদের অংশগ্রহণ প্রায় শুন্যের কোঠায়। ফলে পরিবারে নারীদের উপর নির্যাতন এখনও যেন নিত্যদিনের ঘটনা। নারী সমাজ মানেই যেন অবহেলিত একটি দল।

জাতীয় পর্যায়ের একটি উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে, এসকেএস ফাউন্ডেশন দেশের উত্তরাঞ্চলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী জাগরণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এসকেএস ফাউন্ডেশন নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে উদ্বুদ্ধকরণ, অংশগ্রহণ ও তাদের ক্ষমতায়নে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। কোন কর্মসূচির পরিকল্পনা থেকে ফলাফলে পৌছানো পর্যন্ত নিশ্চিত করা হচ্ছে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। পিছিয়ে পড়া নারী ও মেয়েদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা ও অধিকারভিত্তিক কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সাফল্যের সাথে। ফলে সমাজে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেড়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা। নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠছে পরিবার ও সমাজে। নারী ও মেয়েশিশু নির্যাতন এবং বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। গৃহস্থালী কাজের পাশাপাশি নারীদের আয়বর্ধক কাজের সুযোগ ও তাঁদের অংশগ্রহণ বেড়েছে।

নারীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের নেতৃত্ব বিকাশ, ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকারি বিভিন্ন বিভাগের সাথে নারীদের সংযুক্তি ও সমন্বয় সাধনের কাজ করেছে এসকেএস ফাউন্ডেশন। নারীরা তাঁদের ত্যাগ, মেধা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে এগিয়ে গেছে অনেকদূর। আমাদের চারপাশের অসহায়, নির্যাতিত প্রান্তিক নারীদের জয়িতা বিজয় তারই একটি বড় প্রমাণ। সমাজের বঞ্চিত ও অবহেলিত নারীদের কাছে জয়িতা বিজয়ীগণ অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করবেন। *আমাদের জয়িতারা* পুস্তিকাতে স্থান পাওয়া ২৭ জন জয়িতা তাঁদের নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সমাজের উন্নয়ন তথা দরিদ্র, নির্যাতিত ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অধিকার আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখবেন, এটাই প্রত্যাশা। আমি আশাকরি, অসীম ধৈর্য্য ও অদম্য সাহসে বলিয়ান জয়িতাদের সাফল্যগাঁথা *আমাদের জয়িতারা* সবার কাছে সমাদৃত হবে। পুস্তিকাটি প্রান্তিক মানুষকে সামনের দিকে চলার একটি প্রামাণ্য সহায়িকা হিসেবে গণ্য হবে।

রাসেল আহম্মেদ লিটন
নির্বাহী প্রধান

আমাদের জয়িতারা

সম্পাদকের কথা

অর্থনৈতিক দৈনতা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর ফেলেছে নেতিবাচক প্রভাব। শিক্ষার অভাব, ধর্মীয় কুসংস্কার, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, নারী বৈষম্য প্রভৃতি বাসা বেধেছে এ অঞ্চলে। পরিবারের সাথে পুরুষের বিচ্ছিন্নতা আর পারিবারিক ও সামাজিক কাজে নারীদের সীমাবদ্ধতা এখানে প্রায় সমার্থক। এ বাস্তবতায় জাতীয় উদ্যোগকে সামনে রেখে দেশের উত্তরাঞ্চলে এসকেএস ফাউণ্ডেশন বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী জাগরণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এসকেএস ফাউণ্ডেশনের অনুধাবন- নারী-পুরুষকে নিয়েই উন্নয়ন। এ জন্য দরকার নারীদের উদ্বুদ্ধকরণ, অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন। তাই জোর দেয়া হয় সমাজে ও পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণের ওপর। নারীদের সংগঠিত করার জন্য গঠন করা হয়েছে নারীদল। নারীদল থেকে উঠে এসেছে নারী নেতৃত্ব, গড়ে উঠেছে নারী ফেডারেশন। পিছিয়ে পড়া নারী ও মেয়েদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা ও অধিকারভিত্তিক কর্মসূচিও বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এসকেএস ফাউণ্ডেশনের এসব উদ্যোগের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় সচেতন হয়ে উঠছে নারীরা। সচেষ্ট হচ্ছে তাঁদের অধিকার আদায়ে- পরিবারে, সমাজে। *আমাদের জয়িতারা* পুস্তিকাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে এসকেএস ফাউণ্ডেশনের বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অধিকার সচেতন ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠা এমন ২৭ জন নারী অংশগ্রহণকারীর সাফল্যগাঁথা। নারী অধিকার রক্ষায় সমাজের বিভিন্ন স্তরে অবদান রেখে তাঁরা সরকারি স্বীকৃতিস্বরূপ জয়িতা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। 'জয়িতা' সমাজের সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল নারী'র একটি প্রতীকী নাম। *আমাদের জয়িতারা* পুস্তিকাতে স্থান পাওয়া উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের মূর্ত প্রতীক ২৭ জন নারী কেবল নিজের ইচ্ছাকে সম্বল করে চরম প্রতিকূলতাকে জয় করে সমাজে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন, হয়েছেন জয়িতা। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর- এর নির্বাচিত অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী, শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী, সফল জননী নারী, নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে ঘুরে দাড়িয়েছে যে নারী এবং সমাজ উন্নয়নে অবদান রেখেছে যে নারী- এই পাঁচটি বিভাগে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে তাঁরা জয়িতা স্বীকৃতি পেয়েছেন। এসকেএস ফাউণ্ডেশন- এর নারী অধিকার ও সমাজ উন্নয়নভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় ২০১১-২০২১ সালের মধ্যে গাইবান্ধা ও লালমনিরহাট জেলার সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন এই জয়িতারা।

'অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী' হিসেবে জয়িতার মুকুট পরেছেন লিপি বেগম, শাপলা বেগম, বুলবুলি বেগম, সাহানা বেগম এবং মোসলেমা বেগম। *আমাদের জয়িতারায়* লিপিবদ্ধ তাঁদের সাফল্যগাঁথায় বিবৃত হয়েছে, পারিবারিক টানাপোড়েন এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দাবিয়ে রাখতে পারেনি তাঁদের। দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি নিজেদের তাঁরা সম্পৃক্ত করেছেন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে। নিজের কর্মদক্ষতা, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং কাজের প্রতি একাগ্রতায় আর্থিক দীনতাকে জয় করে হয়েছেন স্বচ্ছল। তাঁরা পথ দেখিয়েছেন আরও দশজন অসহায় নারীকে। এলাকার অসহায় নারীদের পথ-প্রদর্শক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন এই জয়িতারা।

‘সফল জননী নারী’ বিভাগে জয়িতা বিজয়ী হয়েছেন মৌসুমী বেগম। অল্প বয়সে বিয়ে হলেও উচ্চ মাধ্যমিক পাস মেধাবী ছাত্রী মৌসুমী স্বামীর আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যেও ৫ মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ হতে দেননি। সংসার সামলে মৌসুমী নিজের মেয়েদের পড়ানোর পাশাপাশি এলাকায় ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট পড়ান। আয়বৃদ্ধিমূলক কিছু কাজও করেন। এভাবে নিজের আয়ে মেয়েদের পড়াশোনা করিয়ে যাচ্ছেন মৌসুমী। মৌসুমী বেগম গ্রামের একজন সফল জননী ও আদর্শ মা হিসেবে সবার কাছে পরিচিত। *আমাদের জয়িতারা* সবিস্তারে তুলে ধরেছে তাঁর সংগ্রাম ও সফলতার কথা।

‘নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে ঘুরে দাড়িয়েছে যে নারী’ ক্যাটাগরিতে বেলী বেগম, লুৎফা বেগম, মঞ্জুয়ারা বেগম, জোবেদা বেগম, সেলিনা বেগম, কোহিনুর বেগম, রূপালী বেগম এবং অজিফা বেগম উপজেলা পর্যায়ে জয়িতা হিসেবে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়েও জয়িতার মুকুট পরেছেন। ব্যক্তিগত জীবনের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এবং নির্যাতনের বিভীষিকা জয় করে সমাজ ও সংসারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁরা। পারিবারিক নির্যাতন ও নিষ্পেষণ, কোন কিছুতেই হার মানেননি তাঁরা। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, দেনমোহর আদায়, যৌতুকবিহীন বিয়ে, পারিবারিক বিরোধ নিরসন, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধসহ সমাজের বিভিন্ন কাজে রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। নারী অধিকার রক্ষার অদম্য প্রচেষ্টায় তাঁরা দারিদ্র্যকে করেছেন জয়; হয়েছেন সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সফল। তাঁদের প্রত্যেকের সাফল্যগাথার দলিল *আমাদের জয়িতারা*।

‘সমাজ উন্নয়নে অবদান রেখেছে যে নারী’ বিভাগে সমাজের নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে নারী হিসেবে সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জয়িতা হয়েছেন আসমা বেগম, লাভলী বেগম, ঝর্ণা বেগম, ইয়ারন বেগম, সালেহা বেগম, লাইলী বেগম, ছালেকা বেগম, রেখা আক্তার কাজল, রোজিনা বেগম, ফাতেমা বেগম, মিনারা বেগম ও শান্তনা রানী। পুরুষ শাসিত সমাজে অনেক বাধা পেরিয়েও সমাজ উন্নয়নে এই জয়িতারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। উপজেলার গন্ডি পেরিয়ে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়েও জয়িতা হয়েছেন তাঁদের কয়েকজন। বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম যেমন- নারী নির্যাতন, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রতিরোধ এবং পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিরসনে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন তাঁরা। গ্রামীণ দরিদ্র ও অসহায় নারীদের সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে অন্তর্ভুক্ত হতেও সহায়তা করেছেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করেছেন বেকার যুবক-যুবতী ও নারীদের। দুর্যোগকালীন সময়ে বিপদাপন্ন মানুষের পাশে দাড়িয়েছেন এই জয়িতারা। জয়িতাদের নেতৃত্বগুণে তাঁরা কেউ কেউ এখন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। *আমাদের জয়িতারায়* পাঠক খুঁজে পাবেন তাঁদের সাফল্য সিঁড়িভাঙার সেই বাস্তবতা।

এসকেএস ফাউন্ডেশন- এর নারী উন্নয়ন ও নারীদের অধিকার বাস্তবায়ন কর্মসূচির আওতায় বিশেষকরে গ্রামীণ নারীরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এগিয়ে এসেছেন। সচেতন হয়েছেন, সংগ্রাম করেছেন এবং প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। *আমাদের জয়িতারা* এসকেএস ফাউন্ডেশন- এর সহায়তায় ২৭ জন জয়িতার অধিকার সংগ্রাম ও সাফল্যগাঁথার একটি দালিলিক প্রকাশনা।

যোসেফ হালদার

অর্থনৈতিক সফলতায় লড়াকু সাহানার জয়িতা জয়

মোছাঃ সাহানা বেগম (৪১), একজন জয়িতা। গাইবান্ধার সদর উপজেলার বাদিয়াখালী ইউনিয়নের রামনাথের ভিটা বালুচর গ্রামে জন্ম সাহানার। পিতা মোঃ ছাত্তার মিয়া এবং মাতা রোকেয়া বেগম। চার ভাইবোনের মধ্যে সাহানা বড়। পড়াশোনা করার প্রবল আগ্রহ থাকলেও পরিবারে আর্থিক অনটন সাহানাকে বেশিদূর লেখাপড়া করার সুযোগ দেয়নি। মাত্র তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করার সুযোগ পান তিনি। ১৯৯৫ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে গাইবান্ধা পৌরসভার পলাশপাড়া গ্রামের অফিল উদ্দিনের পুত্র মোঃ হারুন-অর-রশিদের সাথে বিয়ে হয় সাহানা বেগমের। স্বামী হারুন-অর-রশিদ গাইবান্ধা জজ কোর্টে মুহুরির কাজ করতেন। বিয়ের পর সাহানা বেগমের দাম্পত্য জীবন মোটামুটি ভালোই চলছিল। ১৯৯৭ সালে একটি কন্যাসন্তান কোলে আসে সাহানার। ২০০০ সালে আবারও একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন, এভাবে পরপর তিনটি কন্যাসন্তানের মা হন সাহানা বেগম।

এরপর হঠাৎ সাহানা বেগমের স্বামী হারুন-অর-রশিদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। শরীরে হিমোগ্লোবিনের অভাব দেখা দেয় ফলে দিনদিন অসুস্থতার মাত্রা বেড়ে যায়। একসময় অসুস্থতাজনিত কারণে হারুন-অর-রশিদ কর্মহীন হয়ে পড়েন। সংসারে নেমে আসে অভাব-অনটন। স্বামী-সন্তানদের নিয়ে একবেলা খেয়ে না খেয়ে অতিকষ্টে জীবন চলতে থাকে সাহানার। সাহানা ভাবেন, তাঁকে কিছু একটা করতে হবে। সে লক্ষ্যে, গাইবান্ধা পৌরসভার পার্শ্ববর্তী ধানঘড়া গ্রামের দর্জি মোঃ আব্দুল খালেকের কাছে নিজ খরচে তিন মাস হাতে-কলমে দর্জির কাজ শেখেন তিনি। পরবর্তী সময়ে সেখানেই দর্জির কাজ শুরু করেন এবং প্রতিদিন ১২০ টাকা পারিশ্রমিকে কাজ করতে থাকেন সাহানা; যা দিয়ে সংসার ও স্বামীর চিকিৎসা খরচ চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। একসময় সাহানা বেগম স্বামী সন্তান নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে যান। এভাবে বাবার বাড়িতে কিছুদিন থাকার পর বাবা ছাত্তার মিয়ার পক্ষেও সংসার চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। সাহানা ভাবেন, এভাবে আর কতদিন বাবার ওপর বোঝা হয়ে থাকা যায়, একটা কিছু করতে হবে। শুরু হয় সাহানার জীবনসংগ্রাম। সিদ্ধান্ত নেন, ঢাকায় গিয়ে গার্মেন্টসে চাকুরি করবেন। পাশের বাড়ির ভাবি জাহানারা বেগম পরামর্শ দেন বিদেশ যাওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণের। পরামর্শ মোতাবেক সাহানা ২০১০ সালের জুলাই মাসে ঢাকার মালিবাগ প্রশিক্ষণ সেন্টারে ১ মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে বাবা ছাত্তার মিয়া ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে ৫০,০০০ টাকা দিয়ে মেয়ে সাহানাকে জর্দানে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। জর্দানে যাওয়ার পর ক্ল্যাসিক ফ্যাশনে মাসিক ২০,০০০ টাকা বেতনের চাকুরি পান তিনি। চাকুরির পাশাপাশি অবসর সময়ে বাসায় অর্ডার নিয়ে কাজ করে অতিরিক্ত আয় করতে থাকেন। সাতবছর পর ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সাহানা দেশে ফিরে আসেন। এভাবে সাহানা পরিবারের দারিদ্র্য দূরে ঠেলে দিতে সক্ষম

হন। দেশে ফিরে সাহানা ৪০০,০০০ টাকা ব্যয়ে বসতভিটার জন্য ৬ শতক জমি ক্রয় করেন এবং ১৫০,০০০ টাকায় তিন রুম বিশিষ্ট একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করেন। ২০০,০০০ টাকা দিয়ে দুই বিঘা জমি বন্ধক নেন এবং ব্যাংকে জমা ৬০০,০০০ টাকা। সাহানা দুটি গরুও পালন করছেন, যার মূল্য প্রায় ৫০,০০০ টাকা। পাশাপাশি দুটি দোকানঘর তৈরি করে ভাড়া দিয়েছেন, যা থেকে মাসে ২,৫০০ টাকা আয় হয়। আত্মনির্ভরশীল হওয়ায় সাহানা বিভিন্ন জায়গায় নেতৃত্ব দিয়ে নারী সচেতনতামূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন অনায়াসেই।

২০১৯ সালে এসকেএস ফাউন্ডেশনের Action for Socio-economic Security and Rights for Excluded and Marginalized Women and Girls (ASSR for EMWG) প্রকল্পের আওতায় বাদিয়াখালী ইউনিয়নের রামনাথের ভিটা বালুচর গ্রামে দুটি নারীদল গঠন করা হয়। একটি বেলি ও অন্যটি সূর্যমুখী নারীদল। সূর্যমুখী নারীদলের সদস্য সাহানা বেগম রামনাথের ভিটা বালুচর গ্রামের পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন এবং কমিটি পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে থাকেন। ASSR for EMWG প্রকল্পের কর্মীদের পরামর্শে আবার নতুন উদ্যমে নিজ বাড়িতে দর্জির কাজ শুরু করেন। সাহানা বেগমের স্বপ্ন– তিনি নিজেই দোকান দিবেন, পুঁজি বাড়াবেন এবং তাঁর দোকানে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবেন। সাহানা বেগম বলেন, "আমি নিজে নারীদের কষ্ট খুব কাছ থেকে দেখেছি, তাদের হৃদয়ের বোবা কান্না আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আমি চাই অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রত্যেক নারীই যেন তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন এবং সমাজে মাথা উঁচু করে চলতে পারেন।" সেই লক্ষ্য নিয়েই এগিয়ে চলছেন সাহানা বেগম। গাইবান্ধা সদর উপজেলা প্রশাসন সাহানা বেগমের সংগ্রামী জীবনের গল্প জেনে এবং সাহসিকতার সাথে একটা সংগ্রাম পাড়ি দিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার জন্য ২০২০ সালে জয়িতা সম্মানে ভূষিত হন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান করায় স্থানীয় নারীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। সাহানাকে দেখে গ্রামের অন্য নারীরা অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীলতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন।

পল্লীবধু শান্তনা রাণীর সংগ্রামী গল্প

শ্রীমতি শান্তনা রাণী ১৯৮৬ সালে রাজপুর ইউনিয়নের তাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-দ্বিজেন্দ্র নাথ বর্মন একজন দিনমজুর ছিলেন। বাবার স্বল্প আয়ে কোন রকমে দিনাতিপাত করতো শান্তনাদের পরিবার। শান্তনার বয়স যখন ১৫ (পনের) বছর, তখন সে রাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। তখন রাজপুর ইউনিয়নের তাজপুর মৌজার মৃত গয়ানাথ বর্মন-এর প্রথম পুত্র শ্যাম চরণ বর্মন এর সাথে তাঁর বিয়ে হলে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। স্বামীর সামান্য উপার্জনে খাওয়া-দাওয়া, পোশাক ও চিকিৎসা কোন রকমে চলতো। বর্তমানে দুই সন্তানের জননী। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ০১-০৩-২০০৪ ইং সালে পুত্র এবং ১৩-০৫-২০১০ ইং সালে মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

সংসারে পাঁচ জনের ভরণপোষণ চালানো শান্তনার স্বামীর পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য ছিলো। তাই ছোট বাচ্চাদের টিউশনি পড়িয়ে এবং পরবর্তীতে স্থানীয় অবহেলিত মহিলাদের নিয়ে পল্লী-সমাজ গঠন করে কাজ শুরু করে শান্তনা। পল্লী-সমাজ উন্নয়নের জন্য প্রত্যেকে ৫ টাকা করে সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। পল্লী সমাজের সভানেত্রী হিসেবে অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে হত-দরিদ্রদের পাশে দাঁড়ান তিনি। কর্মের মাধ্যমে গরু পালন, হাঁস মুরগি, শাক-সবজি চাষ আবাদ করার মাধ্যমে ৭ শতক জমি ক্রয় করেন তিনি। পাশাপাশি ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া খরচ বহন করেন। বর্তমান শান্তনার বড় ছেলে অষ্টম শ্রেণিতে ও একমাত্র মেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। বর্তমানে শান্তনার সংসার মোটামোটি সচ্ছল।

শান্তনা রাণী একজন পল্লীবধু। তাঁর সংগ্রামী গল্প শুনতে চাইলে তিনি বলেন, "পূর্বে আমাকে কেউ চিনতো না। মাত্র ১৫ বছর বয়সে ২০০১ সালে বাল্যবিবাহের গ্যাড়াকলে হয়েছিলাম স্বামীর সংসারে গৃহবন্দি। সংসারের চার দেয়ালে আবদ্ধ থেকেও আমি নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টারত ছিলাম। কম বয়সে সংসার জীবনের কশাঘাতে, শ্বশুর-শাশুড়ির সামাজিক কু-সংস্কার ও অপপ্রচারে আমি কিছুটা স্তম্ভিত হলেও হাল ছাড়িনি। যদিও ১৫ বছরে হতে হয়েছিল গৃহিনী, সহ্য করতে হয়েছিল স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ির অসহ্য বক-বকানি তবু আমি একটুও নিরাশ হইনি। ছোট বেলার চিন্তা ধারাকে আমি লালন করেছি। এই জীবন সংসারে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য আমি নারীদের সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেই সেই ছোটবেলা থেকেই।

আমি নারী সংস্থা, ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হিসেবে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, শিশু পাচার, যৌতুক রোধ করতে সভা সমাবেশ সেমিনার করে ১২০টি বাল্যবিবাহ রোধ করেছি। এছাড়াও ১০/১২টি প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের যৌতুকবিহীন বিয়ে দিয়েছি। তাছাড়াও আমি

রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল, ক্লিন্টার হিলস ওয়ার্ক-এর সদস্য হয়ে পশু পাখির ভাইরাস, রোগ বালাই সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সহায়িকা হয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ করেছি এবং বাড়ি-বাড়ি, মন্দির মসজিদে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বসানোর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছি, স্যানিটেশন, হাত ধোয়া ও গোড়া পাকা নলকূপ বসানোর ব্যাপারে সচেতনতামূলক কাজ করে আসছি। আমি অত্র গ্রামে অবস্থিত বানিয়াটারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য পদে আছি। সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডে 'ওভা'র সদস্য পদে জড়িত হওয়ার কারণে এলাকার দারিদ্র্য নিরসনে কাজ করি। আমি আমার এলাকায় মাতৃকালীন সহযোগিতা, গর্ভবর্তী, এএনসি, প্রসূতি, পিএনসি, নবজাতকের পিএনসি, পরামর্শ দেওয়া, '১৮ বছরের আগে বিয়ে নয়' এবং '২০ বছরের আগে গর্ভধারণ নয়,' এ সম্পর্কে সবাইকে সজাগ করে দেই।

সংসার জীবনে স্বামীর বিশ্বাসভাজন হয়ে তার সহযোগিতায় আমি সমাজের নারীদের একত্র করে তাদেরকে সামাজিক কু-সংস্কার ও সামাজিক অনাচার ও অত্যাচারের বেড়াজাল হতে বেরিয়ে আসার দিক নির্দেশনা দেই। এভাবে আমি বেশ কয়েকজন সহযোদ্ধাকে হাতের নাগালে পাই। আমি তাদের সহযোগিতায় নারীদের মুক্তির প্লাটফর্ম 'নারী মুক্তি ফেডারেশন' গঠনের প্রস্তাব করলে সকলেই তাতে আমাকে আশ্বস্ত করেন। অবশেষে এসকেএস ফাউণ্ডেশনের ActionAid এর অর্থায়নে ২০১২ সালে 'নারী মুক্তি ফেডারেশন' সফলভাবে গঠন করি। এযাবৎ আমি উক্ত ফেডারেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছি এবং উক্ত ফেডারেশনের কার্যপরিধি বিস্তারের লক্ষ্যে বিভিন্ন নামে ২০ দলে ৫০০ নারীদের দলবদ্ধ করে তাদেরকে ফেডারেশনের সদস্যসহ নারী মুক্তির জন্য নানাবিধ কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছি। নারী মুক্তি সামাজিক কার্যকলাপের অংশী হিসেবে আমি ৭নং রাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের 'পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ' নামক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হই। ফলে উক্ত ফেডারেশনের কার্যকলাপ আরও সুদূর প্রসারী হয় এবং সমাজের নারী ও শিশু নির্যাতন নিরোধ, বাল্য বিবাহ বন্ধ, শিশুশ্রম বন্ধ, নারী নির্যাতন ও যৌতুক বন্ধ ইত্যাদি সামাজিক কার্যকলাপ করে আসছি। আমি আমার ৫০০ সদস্যের মধ্যে ১০০ সদস্যের মাঝে ভিজিএফ, ভিজিডি কার্ড পাইয়ে দিতে সহযোগিতা করি। ভবিষ্যতে আমি একজন স্বাবলম্বী নারী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই এবং সমাজে যেসব অবহেলিত নারী রয়েছে তাদেরও স্বাবলম্বী করতে চাই।"

সমাজে শান্তনা রাণীর সাহসী এবং সংগ্রামী ভূমিকার গল্প অন্যান্যদের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে বিবেচনায় এবং তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ লালমনিরহাট সদর উপজেলা প্রশাসনের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৮ সালে জয়িতা নারী হিসেবে পুরস্কারপ্রাপ্ত হন।

নতুন উদ্যমে জোবেদার জীবন শুরু

গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়নের পেপুলিয়া গ্রামের দিনমজুর মোঃ জোবেদ আলীর মেয়ে মোছাঃ জোবেদা বেগম। তিন ভাই ও দুই বোন। ২০১১ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় মাত্র ১৪ বছর বয়সে পার্শ্ববর্তী সাঘাটা উপজেলার পদুমশহর ইউনিয়নের কানিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মোঃ হাবিজারের ছেলে আনিছুরের সাথে জোবেদার বিয়ে হয় ২০,০০০ টাকা যৌতুক প্রদানের শর্তে। এরপর মেয়েকেও সোনা দিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে। বিয়ের সময় গহনাসহ যৌতুকের ১০,০০০ টাকা নগদে পরিশোধও করা হয়। কিন্তু বিয়ের পর জোবেদা এবং জোবেদার পরিবার জানতে পারেন, তাঁর স্বামীর নিজস্ব কোন বাড়ি নেই। অন্যের জমিতে থাকেন। আর অন্যের জমি চাষাবাদ ও মজুরি দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই নিয়ে জোবেদার সাথে স্বামীর পারিবারিক অশান্তি তৈরি হয়। এর রেশ ধরে আনিছুর জোবেদাকে যৌতুকের অবশিষ্ট টাকা আনার জন্য চাপ দেয় এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেন। জোবেদা নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বাবার কাছ থেকে যৌতুকের বাকি ১০,০০০ টাকা এনে দেন স্বামীকে। শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতনের বিভীষিকা তুলে ধরে জোবেদা বলেন, "বিয়েতে পাঁচ থান সোনা অর্থাৎ হাতে বালা, কানে দুল, নাকে ফুল, গলার মালা এবং মাথায় টিকলী এবং নগদ ২০ হাজার টাকা যৌতুক দেওয়ার কথা ঠিক হয়। বলা হয়েছিল, ছেলে নিজস্ব ভিটে বাড়িতে থাকেন। দিনমজুর বাবা আত্মীয় স্বজনদের কাছে টাকা ধার-কর্য করে সবকিছু দিতে পারলেও ১০ হাজার টাকা বাকী রাখেন। আর সেটার জন্যই এতকিছু।"

কিছুদিন যেতে না যেতেই জোবেদার স্বামী ভিটেবাড়ি কেনার জন্য বাবার বাড়ি থেকে আরও টাকা আনার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। জোবেদা রাজি না হলে এক পর্যায়ে তাঁর উপর আবারও শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করেন। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে জোবেদা ইউনিয়ন পরিষদের ৪০ দিনের কর্মসূচিতে মাটি কাটার কাজ করতে থাকেন। এ দিকে তাঁর স্বামীও ঢাকায় গিয়ে রিক্সা চালান। এভাবে কাজ শেষে জোবেদা ৯ হাজার টাকা পান এবং স্বামীও ২০ হাজার টাকা রোজগার করেন। বাবার বাড়ি থেকে আরও কিছু টাকা নিয়ে এসে বসতভিটার জন্য ৫ শতক জমি ক্রয় করেন। এরই মধ্যে জোবেদার পর পর ২টি মেয়েসন্তানের জন্ম হয়। অভাব-অনটন আর পারিবারিক অশান্তির মধ্য দিয়ে তাদের দাম্পত্য জীবন আরো ৪ বছর কেটে যায়।

২০১৯ সালে মার্চে এসকেএস ফাউন্ডেশন পদুমশহর ইউনিয়নের কানিপাড়া গ্রামে Action for Socio-economic Security and Rights for Excluded and Marginalized Women and Girls (ASSR for EMWG) প্রকল্প অবহেলিত নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাঁর গ্রামে কার্যক্রম শুরু করলে জোবেদা 'জবা' নারীদলে অন্তর্ভুক্ত হন এবং সেই দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। জোবেদা দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর দলে আলোচিত বিষয়গুলো

জোবেদা নিজে স্বামীকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। প্রকল্পের কর্মীরা জোবেদা ও তাঁর স্বামীকে নিয়ে কাউন্সেলিং বা পরামর্শ করেন। এই পরামর্শের পাশাপাশি বাড়িতেই জোবেদার কর্মসংস্থান বা আয়ের ব্যবস্থা করার জন্য জোবেদাকে প্রথমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে সেলাই প্রশিক্ষণ এবং সেলাই মেশিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর দর্জি কাজের পাশাপাশি তাঁর নিজস্ব ভিটেবাড়িতে সবজি চাষ এবং হাঁস-মুরগি ও গরু ছাগল পালনের ব্যবস্থা করা হয়। এতে জোবেদা কর্মমুখী হয়ে পড়েন এবং সংসারের খরচ চালাতে থাকেন। এভাবে জোবেদার অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে জোবেদার সংসারে শান্তি ফিরে আসে। এতে জোবেদা ও তাঁর স্বামী বুঝতে পারেন পরিবারের উন্নতির জন্য সবার আগে পরিবারে শান্তি দরকার। আর জোবেদা উপলব্ধি করতে পারেন, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নারী শিক্ষা, পুরুষের সহযোগিতা ও নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়া দরকার। সংসারের চাপে তাঁর পক্ষে এখন পড়াশোনা করা সম্ভব না হলেও স্বামীর এবং পরিবারের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব। আর পরিবারে শান্তির জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন দরকার।

দল থেকে জোবেদা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের বিষয়গুলো ছাড়াও তাঁর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তিনি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে দর্জি প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং প্রশিক্ষণ শেষে একটি সেলাই মেশিন পান। পাশাপাশি বাড়িতে মুরগি-ছাগল পালন শুরু করেন। দিন দিন তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছিল। কিন্তু ২০২০ সালে করোনার কারণে তাদের সংসারে অভাব দেখা দিলে তাঁদের মধ্যে আবারো অশান্তি দেখা দেয়। অশান্তির জের ধরে শুরু হয় নির্যাতন। এই সময় প্রকল্পের পক্ষ থেকে তিন ধাপে ২,৫০০ টাকা করে মোট ৭,৫০০ টাকা করোনাকালীন সহায়তা দেয়া হয়। আবার ঘুরে দাঁড়ান তাঁরা। নতুন করে কাপড় কিনে আবার ব্যবসা শুরু করেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে কঠোর পরিশ্রম করে পূর্বের কেনা জমিতে একটি টিনের ঘর তৈরি করে বসবাস করছেন জোবেদা দম্পতি। পাশাপাশি ৬টি হাঁস, ৩টি মুরগি ও ২টি ছাগল ক্রয় করে পালন করছেন জোবেদা। বাড়ির উঠানে শাক-সবজি আবাদ করে সবজির চাহিদা পূরণ করছেন তিনি। বর্তমানে প্রতি মাসে তারা ২,০০০ টাকা সঞ্চয় করেন। এখন তারা সুখী দম্পতি।

নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে জোবেদা নতুম উদ্যমে জীবন শুরু করায় ২০২১ সালের ৯ ডিসেম্বর সাঘাটা উপজেলা তাঁকে জয়িতা সম্মানে সম্মানিত করেছে।

দারিদ্র্য ডিঙিয়ে লুৎফা বেগমের জয়িতা অর্জন

"দারিদ্র্য, নির্যাতন ও অসহায়ত্ব কোনো বাধা নয়। আত্মবিশ্বাস ও মনোবল শক্ত থাকলে মানুষের জীবন চলার পথে যে-কেনো বাধাই জয় করা সম্ভব।" বলছিলেন, গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার উড়িয়া ইউনিয়নের উত্তর উড়িয়া গ্রামের মোছাঃ লুৎফা বেগম। লুৎফা দারিদ্র্য আর নির্যাতনের পাহাড় ডিঙিয়ে পেয়েছেন জয়িতা স্বীকৃতি। ব্রহ্মপুত্র নদের কোল ঘেঁষে একটি গ্রাম উত্তর উড়িয়া। নদীভাঙন এখানকার প্রতি বছরের নিয়মিত ঘটনা। তাছাড়া বাল্যবিবাহ, প্রতিবন্ধিতা, ভূমিহীনতাসহ বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে এই গ্রামটির মানুষ উন্নত জীবনযাপনে অন্যদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। ভাঙতে ভাঙতে উড়িয়া গ্রাম নদীর একেবারে রাক্ষুসী মুখের দুয়ারে উপনীত। সেই গ্রামের তৃণমূল পর্যায়ের একজন নারী লুৎফা বেগম। দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে জীবনযুদ্ধে অনবরত লড়াকু ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জীবন জয়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে সমাজের কাছে এখন একজন সম্মানিত জয়িতা। লুৎফার পরিবারে ছিল বাবা-মা এক বোন আর দুই ভাই। বাবা দিনমজুরি করে কোনো রকমে সংসার চালাতেন। অভাব অনটনের সংসারে বড় হতে থাকা লুৎফাকে মাত্র ১৩ বছর বয়সে বাবা-মার ইচ্ছায় বিয়ে করতে হয়।

বিয়ের ২ বছর পর লুৎফার কোল জুড়ে আসে সুন্দর ফুটফুটে একটি মেয়েসন্তান। মেয়ে হয়েছে বলে পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে শুনতে হয় নানা বিরক্তি আর আপত্তিকর মন্তব্য। স্বামী দুলামিয়া বেকার, মাঝে মধ্যে দিনমজুরি করতো। বিয়ের পর সংসারের খরচ বেড়ে যাওয়ায় শ্বশুর-শাশুড়ি সংসার আলাদা (ভেন্ন) করে দেয়। শুরু হয় নির্যাতনের অধ্যায়। স্বামী দুলামিয়া লুৎফাকে বাবার বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ দিতে থাকে। এক পর্যায়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে থাকে লুৎফা। একটি সন্তান আর স্বামীকে নিয়ে ছোট্ট একটা খড়ের ঘরে বাস করতো তারা। স্বামী মাঝেমধ্যে জুয়া খেলার নেশায় পড়লে নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। জুয়া খেলে গভীর রাতে বাড়ি ফিরে কর্কশ মেজাজে লুৎফাকে নানান আপত্তিকর কথা বলতো, ফলে দুজনের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করতে থাকে। লুৎফার চোখের পানি ঝরতে থাকে প্রতি রাতে। লুৎফার কথায় 'কত রাত যে না খেয়ে চোখের জল ফেলেছি তা বলতে পারব না। চিন্তা করেছি, এভাবে আর কতদিন চলবে? কিছু একটা করা দরকার। তাই নিজের হাত আর ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নেমে পড়ি।' প্রথমে লুৎফা অন্যের বাড়িতে কাঁথা সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। একটা কাঁথা সেলাই করে ২৫০-৩০০ টাকা পেতেন; তাই দিয়ে কোনোরকমে দিন চলতে লাগলো। মাঝেমধ্যেই কাঁথা সেলাইয়ের টাকাও স্বামী কৌশলে কেড়ে নিয়ে জুয়া খেলতো। এ অবস্থার মধ্যেই লুৎফা দ্বিতীয় সন্তানের মা হন। এবার ছেলেসন্তান।

কিছুটা স্বস্তি। তবে চারজনের সংসার, খরচ আরও বেড়ে যাওয়ায় দুশ্চিন্তাও বাড়তে থাকে। সেই সময় ২০১৬ সালে এলাকায় শুরু হয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এসকেএস ফাউন্ডেশনের Strengthening Household Ability to Respond to Development Opportunists (SHOUHARDO-III) প্রকল্পের কাজ ।

SHOUHARDO-III প্রকল্পের অধীনে লুৎফা একতা নামের একটি দলের সদস্য হিসেবে যুক্ত হন। লুৎফা বলেন, "একটা কল্পনার ছবি (ক্ষমতায়িত নারী) কিভাবে মানুষের ভবিষ্যৎ বাস্তবতায় মিলে যেতে পারে তার অন্যতম উদাহরণ আমি।" দলের সভা বসলে সংস্থার কর্মীদের সহায়তায় স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অংশগ্রহণ করেন, আলোচনা শুনেন; বদলাতে থাকে স্বামীর আচরণ। SHOUHARDO-III কর্মসূচির সহযোগিতায় ছাগল পালনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন লুৎফা এবং একই সাথে ৪,৫০০ টাকা গ্রহণ করে ২টা ছাগল ক্রয় করেন। সেই ছাগল প্রতিপালন করে ২ বছর পর ৭টি ছাগল বিক্রি করে একটি গরু ক্রয় করেন তারা। আবার গরু মোটা-তাজা করে বাজারে বিক্রি করে আর্থিকভাবে ভালোই লাভবান হন তারা। আবার লুৎফার স্বামীও অটোরিক্সা চালাতে থাকেন। অটোরিক্সা চালিয়ে ভালো আয় করতে শুরু করেন দুলামিয়া। আর্থিক অবস্থা ভালো হতে থাকলে নিয়মিত সঞ্চয় করতে শুরু করেন এই দম্পতি। জমি বর্গা নিয়ে চাষ করলে সেখানেও বেশ ভালো লাভ পেতে থাকেন। পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি– এই কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন পরিশ্রমী লুৎফা। নিজে কাপড় কাটা শিখে সেলাইয়ের কাজও করতে থাকেন নিয়মিত। কাজের ফাঁকে একই দোকানে মুদির ব্যবসাও করেন তিনি। বর্তমানে দোকানে দৈনিক ৮০০-১,০০০ টাকা বিক্রি হয়; লাভও থাকে ভালো।

এখন তাদের একটি টিনের ঘর হয়েছে। লুৎফা নিজের নামে জমিও বন্ধক নিয়েছেন । বাচ্চাদেরকে পড়াশোনা করানোর সক্ষমতাও অর্জিত হয়েছে পরিবারটির। পরিবারের দায়িত্ব পালনের মাঝেও গ্রামের অন্যান্য নারীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করেন। লুৎফার কাপড় সেলাইকে অনুসরণ করে গ্রামের আরও অনেকেই বাড়িতে বসে সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। এলাকার অন্যান্য নারীকে সাথে নিয়ে বাল্য বিবাহ এবং নারী-নির্যাতন প্রতিরোধে তাঁর ভূমিকা অগ্রগামী। এলাকার মানুষ আগের চেয়ে অনেক সম্মান করেন এবং বিপদ-আপদে লুৎফার কাছে ছুটে যান। লুৎফা বলেন, "আমার স্বামী এখন আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেন, এটা আমার কাছে স্বর্গের মতো মনে হয়। পরিবারের যে-কোনো কাজ দুই জনে পরামর্শ করেই করি। আমার নিজের হাতে পয়সা হয়েছে, আমার নামে জমি হয়েছে, আমি নিজে এখন স্বাবলম্বী, অনেকেই আমাকে অনুসরণ করেন। আমার স্বামীও আমার সিদ্ধান্তকে সম্মান করেন।"

বর্তমানে লুৎফা একজন সুখী নারী। তিনি বলেন, "অতীতে অনেক নির্যাতন সহ্য করেছি, কষ্ট পেয়েছি, অভুক্ত থেকেছি, চোখের জল ফেলেছি। তারপরও বলি, নির্যাতন, দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব কোন বাধা নয়, যদি নিজের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল শক্ত থাকে, তবে জীবন চলার পথে যে কোনো বাধা জয় করা সম্ভব।" লুৎফা উড়িয়া গ্রামে একজন ইতিবাচক পরিবর্তনের আদর্শ। একজন সাহসী এবং ধৈর্য্যশীল নারী। বিগত দিনের দুঃস্বপ্নের অন্ধকারের দিন পেরিয়ে নতুন স্বপ্নীল দিনের হাতছানিতে উচ্ছ্বসিত লুৎফা বেগম। সমাজ পরিবর্তনে যারা ভূমিকা রাখেন লুৎফা তাদেরই একজন। তিনি নিজের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজের নানাবিধ কর্মতৎপরতায় তাঁর শ্রম, মেধা, দক্ষতা এবং মানসিকতাকে সর্বোত্তম ব্যবহার করেছেন। তাই জয়িতা নির্বাচনে প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটিও লুৎফাকে সম্মাননা জানানোর সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন কোনো রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই। তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে উপজেলা সফল জয়িতা হিসেবে। ২০২০ সালের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবসের আয়োজিত অনুষ্ঠানে লুৎফা বেগমের হাতে তুলে দেওয়া হয় জয়িতা সম্মাননা পুরস্কার।

সংগ্রামী কাজলের বদলে যাওয়া জীবন

প্রতিবন্ধিতা মানব সমাজের বোঝা নয়। ভালো যত্ন করতে পারলে কখনো কখনো এই প্রতিবন্ধী মানুষগুলো সম্পদ হয়ে ওঠে। সমাজে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যে, প্রতিবন্ধী মানুষও কোন কোন সময় তাঁর মেধা ও দক্ষতা দিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করেছে। অথবা সমাজকে বিস্ময়কর কিছু উপহার দিয়েছে। এমন বিষয় গ্রামাঞ্চলে তেমন দৃশ্যমান না হলেও ছোট ছোট অনেক ঘটনাই আমাদেরকে স্বপ্ন দেখায়। তখন মনে হয় সমাজের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে যতটা দুশ্চিন্তায় আমাদেরকে ফেলে দেয়, হয়তো ততোটা হওয়ার কথা নয়।

শ্রীপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের একটি দুর্যোগ-প্রবণ গ্রাম লাহিরি খামার কেল্লাবাড়ী। প্রায় প্রতিবছর বন্যায় ভেসে যায় এই অঞ্চল, ভেঙ্গে যায় অনেক বাড়ি-ঘর। এই গ্রামে বাস করেন কাজল রেখা। জন্মগত প্রতিবন্ধী নন। কাজল রেখা দু-চোখে স্বপ্ন নিয়ে পড়ালেখা করতে থাকেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বাবা-মা না থাকায় ভাইয়েরা বিয়ে দিয়ে দেয় তাঁকে। হঠাৎ এক ঝড় এসে লণ্ডভণ্ড করে দেয় তাঁর জীবন। বাড়িতে সবজির চালায় চেয়ারে লাগিয়ে সিম উঠানোর সময় চেয়ার ভেঙ্গে পড়ে গিয়ে তার মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে যায়। অনেক চিকিৎসা করেও স্বাভাবিক জীবন-যাপনে ফিরে আসতে পারেন না কাজল। দুই চোখের আলো নিভে যাওয়ার সাথে সাথে মনের রং-তুলিতে আঁকা স্বপ্নগুলোও নিভে যেতে শুরু করে। স্বামী মুখ ফিরিয়ে নেন তাঁর দিক থেকে। শ্বশুরবাড়ির লোকজন কোন খোঁজখবর রাখে না। স্বামীর পরিবার যখন মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন সে বাঁচার আশায় অন্যের সহযোগিতা কামনা করে। অনেক রাত, অনেক দিন না খেয়ে দিন কেটে যায় তাঁর।

এসকেএস ফাউণ্ডেশন হাত বাড়িয়ে দেয় কাজলের দিকে। তথ্য সংগ্রহের পর অতিদরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত হন কাজল। কর্মসূচির ভিডিসি ও 'একতা' দলের সদস্য হন কাজল। একতা দলের সভায় নিয়মিত উপস্থিত থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে, অন্যের সংসারের বোঝা না হয়ে নিজেকে বদলানো প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে এসকেএস কর্মসূচির মাধ্যমে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কর্মসূচির আওতায় সেলাই প্রশিক্ষণ নেয়ার পর এসকেএস থেকে নগদ ৮,২১০ টাকা এককালীন সহযোগিতা গ্রহণ করেন। এই সহযোগিতার অর্থ দিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করে কাজ শুরু করেন। এর ফলে সেলাইয়ের কাজ করে আয় বাড়তে থাকে এবং তিনি চিন্তা করেন যে শুধু এটা করলে চলবে না। এর সাথে আরও কোন কাজ করতে হবে। তখন তিনি আয়ের টাকা দিয়ে কাপড় কিনে

এনে বিক্রি শুরু করেন। কাপড় বিক্রি ও সেলাই- এর টাকা দিয়ে জীবনের মোড় বদলাতে থাকেন কাজল। ধীরে ধীরে মর্যাদা লাভের সুযোগে শক্তি-সামর্থ্য অর্জন হলে এসকেএস ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতায় ইউনিয়নের ৬২ জন প্রতিবন্ধীকে সাথে নিয়ে ৪টি সহায়ক দল এবং ১৫ জন প্রতিবন্ধী সদস্য নিয়ে একটি এপেক্স বডি গঠন করেন। প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আদায়ে সচেষ্ট. দক্ষতা অর্জন, চিত্তবিনোদনসহ বিভিন্ন কাজে সভাপতি হিসেবে কাজ শুরু করেন কাজল। তিনি এলাকাবাসী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ে কাজ করেন। বন্যা, নদীভাঙন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ সহযোগিতাসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে গ্রামবাসীদের সহযোগিতা করেন। সরকারি বেসরকারি সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য হুইল চেয়ার, কানের শ্রবণ যন্ত্র, ক্র্যাচ, সাদাছড়ি, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য চশমা, ঝরেপড়া শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের লেখাপড়া করার জন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো, স্মার্ট কার্ড পাইয়ে দেয়া সহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার জন্য স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করেন কাজল। প্রতিবন্ধী কাজলের প্রতি এলাকার মানুষের ভালোবাসা আর মর্যাদা বাড়তে থাকে। অনেকেই তাঁর উপর ভরসা করতে শুরু করে। কাজলের সহযোগিতায় গ্রামবাসী তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানদেরকে বেঁড়ে উঠতে মানসিক শক্তি পায়। কাজল গ্রামের অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত শিশু, নারীসহ সকলকে এই ধরনের কাজ করতে আগ্রহের সৃষ্টি করতে সমর্থ্য হয়েছেন। অনেকেই সেলাইয়ের কাজ শেখার জন্য কাজলের কাছে আসেন। আন্তরিকতা আর আনন্দের সাথে সেই কাজটিও করে সুনাম অর্জন করেন কাজল। কাজল এখন শ্রীপুর ইউনিয়নের মধ্যে আদর্শ মানুষ। সততা দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদে পিছপা হোন না তিনি। নিজের আয়-রোজগার দিয়ে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মাধ্যমে নিজের জীবনকে বদলে দিয়েছেন কাজল। প্রতিবন্ধী কাজলের জীবন সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে সফলতার জন্য তাঁকে ২০২০ সালে জয়িতা সম্মানে ভূষিত করা হয়।

নির্যাতনের প্রতিবাদেই সেলিনার উন্নয়নযাত্রা শুরু

মোছাঃ সেলিনা বেগম। গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার হরিরামপুর ইউনিয়নে সোনাইডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। সেলিনা বেগমের বয়স ৩২ বছর। পিতা মোঃ দেলোয়ার হোসেন, মাতাঃ মোছাঃ ইজারবী বেগম। সেলিনার বাবা পেশায় একজন দিনমজুর। পরিবারে এক ভাই, চার বোন। ভাইবোনদের মধ্যে সেলিনা সবার ছোট। ছোটবেলা থেকেই তাঁদের জীবন চলছে অভাবের মধ্য দিয়ে। পরিবারে সদস্যসংখ্যা বেশি হওয়ায় বেশির ভাগ সময়েই তাদের দিন কেটেছে না খেয়ে। অভাবের মধ্যেও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কোনো কার্পণ্য করেননি সেলিনার বাবা। খুব মেধাবী ছাত্রী ছিল সেলিনা। সেলিনার স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া করে মানুষের মতো মানুষ হবেন। সেলিনার বাবা দিনরাত পরিশ্রম করে সংসার চালাতেন। একসময় তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন। তাঁর শরীর আর চলে না; বেশ অসুস্থ এবং অসহায় বোধ করেন। পরিবারের খরচ বহন করা তাঁর জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কী করবেন ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়েন। বাধ্য হয়ে সেলিনাকে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেলিনার বয়স তখন ১৪ বছর। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। বিয়ের কথা শুনে সেলিনা প্রতিবাদ জানায়, "এখন বিয়ে করব না।" কিন্তু শত চেষ্টা করেও সেলিনা বাবার সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনতে পারেননি। একান্ত বাধ্য হয়েই তাঁকে বসতে হয় বিয়ের পিঁড়িতে।

২০০৭ সালে নাকাইহাট ইউনিয়নের প্রোগইল গ্রামের মোঃ আফসার আলীর ছেলে আঃ রাজ্জাক আলীর সাথে বিয়ে হয়ে যায় সেলিনা বেগমের। বিয়ের সময় ৪০,০০০ টাকা যৌতুক দেয় সেলিনার বাবা। সেলিনার স্বামী দিনমজুর হওয়ায় রোজগার কম; তাই বিয়ের কিছুদিন পর সেলিনার বাবার কাছ থেকে আরো ৩০,০০০ টাকা যৌতুক দাবি করে। স্বামীকে খুশি রাখার জন্য বাবার সংসারে অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও সেলিনা তাঁর বাবার কাছ থেকে ১০,০০০ টাকা এনে দেন স্বামীকে। বাকি ২০,০০০ টাকা না দেওয়ার কারণে স্বামীর কাছ থেকে নিয়মিতভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হয় তাঁকে। ঠিকমতো খাবার দেয় না। দিন-রাত সংসারে কাজের মধ্যে ব্যস্ত রেখে নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। দিনের পর দিন স্বামী, শ্বশুরবাড়ির লোকদের কাছ থেকে অবহেলা, লাঞ্ছনা পেতে থাকেন সেলিনা। নির্যাতনের মাত্রা বাড়তেই থাকে। স্বামীর বাড়িতে আর কোনোভাবেই মন বসে না সেলিনার। তিনি নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেন। একদিন সেলিনা স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়িকে জানান তিনি স্কুলে ভর্তি হবেন, আবারও লেখাপড়া করবেন। কিন্তু তাঁর কথা কে শোনে! নিরুপায় হয়ে সেলিনা তাঁর স্বপ্নকে দূরে ঠেলে দেন। আর সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেন "নারী বলে আমি পিছিয়ে থাকব না; লেখাপড়া না হলেও একদিন আমি উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাবই"।

২০০৯ সালে সেলিনা এসকেএস নাকাইহাট ব্রাঞ্চ অফিসে যোগাযোগ করেন এবং তাঁর বাড়িতে ৪০ জন নারী সদস্য নিয়ে একটি সমিতি গঠন করেন। সেলিনাকে সমিতির সভাপতি নির্বাচন করা হয়। সমিতির কার্যক্রমে তাঁর সফল অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতায় সেলিনা প্রথমে ২০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি গরু ও একটি ছাগল ক্রয় করে বাড়িতে পালন শুরু করেন। পাশাপাশি এসকেএস ফাউন্ডেশনের 'সংযোগ' প্রকল্প থেকে ১৫ জনকে সংগঠিত করে সবজি চাষের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শুরু করেন বাড়ির উঠানে সবজি বাগান, হাঁস-মুরগি পালন। সবজি বিক্রি করে যা উপার্জন হয় তা দিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোসহ কিছু টাকা সঞ্চয় করেন সেলিনা। সেলিনার দুই ছেলে। তাঁর জীবনে যে স্বপ্নগুলো আড়ালে লেগেছে তা নিজের ছেলেদের মধ্য দিয়ে পূরণ

করার প্রতিজ্ঞা তাঁর। সেলিনার জীবনের এই পরিবর্তন-যাত্রায় পরিবারের অন্য সদস্যরা সহযোগিতার হাত বাড়ায়নি। তারপরও থেমে থাকেনি সেলিনার স্বপ্নযাত্রা। উন্নয়নের পথ ধরে জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান সেলিনা।

এসকেএস ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে কম্পোস্ট সার তৈরি করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন সেলিনা। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি নিজের উদ্যোগে কম্পোস্ট সার তৈরির কাজ শুরু করেন এবং বাজারে বিক্রি করতে থাকেন। সবকিছু মিলিয়ে সেলিনা বেগমের মাসিক আয় দাঁড়ায় ৬,০০০-৭,০০০ টাকা। সেলিনার এসব কার্যক্রমের ফলাফল দেখে স্বামীসহ পরিবারের সকলে তাদের নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং সকলে সেলিনার কাজে সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। সেলিনা বুঝতে পারেন তাঁর অর্থের জোগানই পরিবারের অন্য সদস্যদের তাঁর কাছে ভিড়তে উৎসাহিত করছে। সেলিনা বলেন, "আমি উপলব্ধি করলাম, নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নই নারীর প্রতি সহিংসতা কমিয়ে আনতে সহায়তা করবে।" তিনি চিন্তা করেন, তাঁর মতো আরও অনেক অসহায়, নির্যাতনের শিকার নারী যারা নিজেদের সমস্যার কথা, নিজেদের স্বপ্নের কথা কাউকে বলতে পারে না, তাদেরকেও উন্নয়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যাতে করে তারা যেন তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়; কোনো রকম নির্যাতনের শিকার না হয়। এজন্য সবাইকে সোচ্চার করতে হবে।

সেলিনা অসহায় নারীদের সহায়তা করার জন্য গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ শুরু করেন। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, নারীর উন্নয়ন ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজে নেমে পড়েন তাঁর দলসহ। তাদের উদ্দেশ্য ও নতুন উদ্যোগের কথা আলোচনা করেন এসকেএস ফাউন্ডেশনের উন্নয়ন কর্মীদের সাথে। ফলে ১২ এপ্রিল ২০১৯ এসকেএস ফাউন্ডেশনের Action for Socio-economic Security and Rights for Excluded and Marginalized Women and Girls (ASSR for EMWG) প্রকল্পের আওতায় প্রোগইল গ্রামে 'বকুল' নারীদল গঠন করা হয়। সেলিনাকে নির্বাচিত করা হয় দলের সভাপতি। ASSR for EMWG প্রকল্পের কাজের মাধ্যমে সেলিনা নারী নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ গ্রহণসহ নানা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। নারী দলের নিয়মিত সভার মাধ্যমে বিভিন্ন আইন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে দলের সকলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, দেনমোহর আদায়, যৌতুকবিহীন বিয়ে, পারিবারিক বিরোধ পারিবারিকভাবে নিরসন, সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্নভাবে জনগণের মাঝে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেন।

এলাকার মানুষ দেখেন সেলিনা বেগমের স্বপ্নপূরণে এগিয়ে যাওয়া; তাঁর মতো অবহেলিত নারীদের সকল দুর্দশা ও কষ্ট মুছে নতুন করে জীবন গড়তে স্বপ্ন দেখানো। সাধারণ মানুষ আশাবাদী হন যে, সেলিনা বেগম স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, পরিচালিত করছেন গ্রামের পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত সেই সকল নারীকে যাদের জীবন ও স্বপ্ন দুটোই অকালে নষ্ট হয়েছে। সহিংসতার শিকার অসহায় নারীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জীবনের সকল গ্লানি ও হতাশা দূর করে নতুন জীবন গড়তে সর্বাত্মক সহযোগিতায় কাজ করে যাচ্ছেন সেলিনা ও তাঁর দলের সদস্যরা। সেলিনার এ ধরনের কাজের স্বীকৃতি দিতে এবং নির্যাতিত ও নিপীড়িত নারীদের পাশে থেকে তাদের লড়াকু হতে সহযোগিতার মাধ্যমে আগামী দিনের স্বপ্নপূরণে আরও বেশি উদ্যোগী হতেই গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা তাঁকে ২০২০ সালে জয়িতা নির্বাচন করেন; হাতে তুলে দেন সম্মাননা।

সমাজ সচেতন সালেকা এখন জয়িতা

মোছাঃ ছালেকা বেগম, স্বামী- মোঃ আবুজল মিয়া। গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার উড়িয়া ইউনিয়নের মধ্য উড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। নদীভাঙন এবং বন্যাকবলিত এলাকা হওয়ায় গ্রামে অন্যান্য সমস্যার পাশাপাশি তুলনামূলকভাবে লেখাপড়ার হারও কম। অসচেতনতার কারণে অভাবী পরিবারগুলো সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তেমন কোন সেবাও গ্রহণ করতে উৎসাহিত হয় না। এমনকি সেবা গ্রহণের জন্য যে তাগিদ সেটাও বোধ করে না কেউ। এভাবেই চলতে থাকে তাদের জীবন। প্রতিবছর নদীভাঙনের কারণে দারিদ্রের মধ্যে থেকে কেউ বের হতেও পারেন না। এ বাস্তবতায় ছালেকা বেগম এসকেএস ফাউন্ডেশনের সৌহার্দ্য-৩ কর্মসূচির একতা দলের একজন নারী সদস্য হিসেবে দলভুক্ত হন। একতা দলে এসে তিনি জানতে পারেন, কিভাবে একজন নারীর ক্ষমতায়ণ হয় এবং নারীরা কোন কোন কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারি সেবা পাওয়া যায় ইত্যাদি বিষয়।

তারপর থেকে সালেকা বেগম এলাকার বাল্যবিবাহ নিরোধে, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে, পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিরসনসহ এলাকার মানুষের জন্য সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। এলাকায় সরকারি বিভিন্ন সেবা প্রদান যেমন টিকাদান কর্মসূচি, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুতি গ্রহণ ও উদ্ধার, ত্রাণ বিতরণে সহায়তা, অপরাধমূলক কাজের ক্ষেত্রে সালিশের আয়োজনে সহায়তা করা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য সঠিক দরিদ্র পরিবার অন্তর্ভুক্ত করাসহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সহায়তা করেন। এছাড়াও বন্যার সময় কিভাবে এলাকার মানুষকে সহযোগিতা করা যায় সে লক্ষ্যে কাজ করেন। বন্যার সময় এলাকার রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে গেলে তিনি সকলের সহযোগিতা নিয়ে ছোট খাটো রাস্তা মেরামত করেন। ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বারদের সাথে যোগাযোগ করে এলাকার গরীব, অতি-গরিবদেরকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদানে সহযোগিতা করেন। তিনি উপজেলা পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে এলাকার অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান। বর্তমানে তিনি একতা নারী দলের

সভাপতি। দল পরিচালনায় তিনি সব সময় বিভিন্ন ধরনের কাজে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। এলাকার মানুষ তাঁকে নেত্রী বলে সম্বোধন করেন এবং নেত্রী হিসেবে তার পরিচিতি ব্যাপক। ইউনিয়ন পরিষদের যেকোন ধরনের অনুদানে জনগনের সঠিক প্রাপ্তিতে জবাবদিহিতামূলক প্রক্রিয়ায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। ইউনিয়ন পরিষদের সকল ধরনের সেবা গ্রহণ করতে এলাকার মানুষ তাঁর সহযোগিতা নিয়ে থাকেন।

সালেকা বেগম তাঁর দলের সদস্য এবং এলাকার গণ্যমান্য মানুষকে সাথে নিয়ে নানাধরনের সেবামূলক কাজে দায়িত্ব পালন করে সফল হয়েছেন। তাঁর নিজ গ্রাম ও সংলগ্ন এলাকায় ২৭টি বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করতে সমর্থ্য হয়েছেন। ২৩টি পরিবারকে পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে সহায়তা করেছেন। ৪৭টি পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিরসনে ভূমিকা পালন করেছেন। এলাকাবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে নিজ গ্রামে বন্যা-পরবর্তী সময়ে স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা মেরামত করেছেন। রাস্তার পাশে ও পতিত জমিতে প্রায় ৩,০০০টি বৃক্ষরোপন করেছেন। বন্যা বা যেকোন দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয় মেরামতের জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্থানীয় শিক্ষা অফিসের সাথে যোগাযোগ করে বিদ্যালয় মেরামত করতে সহায়তা করেছেন। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় যথাযথ অংশগ্রহণকারী নির্বাচনে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করেছেন ইত্যাদি।

সামাজিকভাবে এসব উন্নয়ন কাজে সালেকার অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ ২০১৯ সালে ফুলছড়ি উপজেলা প্রশাসনের কাছ থেকে তিনি একজন সফল জয়িতা হিসেবে সম্মাননা পুরস্কার লাভ করেন। জয়িতা সম্মাননা পাওয়াতে নারী নেত্রী হিসেবে এলাকায় তার গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, কর্মী, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে সালেকার পরিচিতি নারী নেত্রী হিসেবে তাঁর অবস্থান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী দিনে সকলকে সাথে নিয়ে আরও এগিয়ে যেতে চান সালেকা।

রত্নগর্ভা মৌসুমীর জয়িতা সম্মাননা অর্জন

বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার কাগাইল ইউনিয়নের সুলতানপুর গ্রামের আব্দুস ছাত্তার আকন্দ ও মোছাঃ সাহেরা বেগমের ছোট মেয়ে মৌসুমী বেগম। বয়স ৪৪ বছর। তিন ভাই আর দুই বোন নিয়ে ছিল তাদের সংসার। বাবা এলাকার কৃষিজমিতে দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালাতেন। ১৯৯২ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে ৭ম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় মৌসুমীর বিয়ে হয় গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার পদুমশহর ইউনিয়নে চকদাতেয়া গ্রামের নওশের আলীর তৃতীয় ছেলে মোঃ আমির হোসেনের সাথে। শ্বশুর বাড়ির আর্থিক অবস্থাও ভালো ছিল না। শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদ নিয়ে মৌসুমীর ছিল যৌথ পরিবার। আর এইচএসসি পাশ মৌসুমীর স্বামী ছিলেন সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। তিনি এলাকায় অন্যের জমিতে বর্গাচাষ করে সংসার চালাতেন। এক এক করে মৌসুমীর ঘরে ৫টি মেয়েসন্তানের জন্ম হয়। বর্ধিত সংসারের খরচ চালাতে গিয়ে মৌসুমী একসময় নিজের মেয়েদের পড়ানোর পাশাপাশি এলাকায় ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট পড়ানো শুরু করেন। স্বামী ঢাকায় গিয়ে একটি পোশাক তৈরির কারখানায় চাকুরি করেন। সেখানে সুবিধা করতে না পেরে স্বামী বাড়িতে ফিরে এসে একটি ওষুধ কোম্পানির ডেলিভারিম্যান হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং বর্তমানে সেই কাজই করছেন।

২০১৯ সালে মৌসুমী বেগম এসকেএস ফাউন্ডেশনের কর্মসূচির আওতায় চকদাতোয়া প্রভাতী নারী দলের সদস্য হন। "সদস্য হিসাবে আমি প্রথমে নারীদের অধিকার ও সুরক্ষার ওপর প্রশিক্ষণ পাই। এরপর আমি আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের অংশ হিসেবে বসতবাড়িতে সবজি চাষ এবং গরু মোটা-তাজাকরণের ওপরও প্রশিক্ষণ পাই। প্রশিক্ষণ পেয়ে আমি বাড়ির উঠানে মাচায় লাউ ও শিমের চাষ করি। পাশাপাশি আমার জমানো সঞ্চয় থেকে ছোট গরু কিনে পালন করতে থাকি। এভাবে গরু মোটা তাজাকরণ ও সবজি চাষ করে আর্থিকভাবে ভালোই সফলতা পাই। ২০২০ সালে আমি এক মৌসুমে প্রায় ৫০০টি লাউ বিক্রি করে প্রায় ২০,০০০ টাকা আয় করি।" মৌসুমী বেগম বলেন তাঁর সাফল্য যাত্রার শুরুর কথা।

৮ম শ্রেণি পাশ করার পর তাদের প্রথম মেয়েটির বিয়ে হয়। অন্য মেয়েরা এখনো পড়াশোনা করছেন। মেয়েরা পড়াশোনায় বেশ ভালো হওয়ায় মৌসুমী তাদেরকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করাচ্ছেন। দ্বিতীয় মেয়ে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে (ডিপ্লোমা কোর্সে) পড়াশোনা শেষ করে এখন ঢাকায় চাকুরির পাশাপাশি বিএসসি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করছেন। তৃতীয় মেয়ে ঠেঙ্গামারা মেডিকেল কলেজে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট (প্যারামেডিকেল ডিপ্লোমা কোর্সে) সম্পন্ন করে গাইবান্ধা সদর ক্লিনিকে ইন্টার্নি করছেন। চতুর্থ মেয়ে ৭ম শ্রেণিতে এবং পঞ্চম মেয়ে ৫ম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে।

বড় দুইটি মেয়ে পার্টটাইম চাকুরি করে অর্থ উপার্জন করে নিজের ব্যয় নির্বাহের পর বাবা-মাকে সাহায্য করছেন। তাদের হাত ধরে মৌসুমীর পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে। মেয়েদের বোঝা নয়, সম্পদ করে গড়ে তুলেছেন তিনি। বর্তমানে মৌসুমী বেগম গ্রামের একজন সফল ও আদর্শ মা হিসেবে সবার কাছে পরিচিত। মৌসুমী বেগম যেমন নিজের দারিদ্র্যকে জয় করেছেন তেমনি সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকেও জয় করেছেন। এই জয়ের পুরস্কার হিসেবে তাঁকে ২০২১ সালের ৯ ডিসেম্বর উপজেলা পর্যায়ে জয়িতা সম্মান প্রদান করা হয়। এখানেই শেষ নয়। তাঁর জয়িতা সম্মাননার সূত্র ধরে ২০২১ সালের স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মৌসুমী বেগম ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড থেকে সংরক্ষিত মহিলা আসনে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। এলাকাবাসী তাঁর সততা ও কঠিন জীবন সংগ্রামের প্রত্যয় দেখে তাঁকে জয়ী করেছেন। মৌসুমী বেগমের স্বপ্ন, "আমি এলাকায় নেতৃত্ব দিয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করবো এবং সমাজের উন্নয়ন নিশ্চিত করবো।"

সমাজ উন্নয়নে অবদান রেখে লাভলী বেগম জয়িতা

১৯৭৫ সালে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার নাকাইহাট ইউনিয়নের ডুমুরগাছা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মোছাঃ লাভলী বেগম। সাত বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে লাভলী সবার বড়। দিনমজুর বাবার বড় সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকতো। লাভলী ছিলেন সুন্দরী। সৌন্দর্যই যেন কাল হলো তাঁর জীবনে। লাভলী যখন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী তখন একই গ্রামের ছেলে মোঃ শহিদুল হক প্রায়ই তাঁকে উত্ত্যক্ত করতো এবং শিশু লাভলীকে বিয়ের প্রস্তাব দিতো। কর্ণপাত করেননি লাভলী। কিন্তু ১৯৮৭ সালে ৫ম শ্রেণিতে পড়া অবস্থাতেই লাভলীকে তুলে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক বিয়ে করেন শহিদুল। বিয়ের পর কোনোভাবেই লাভলীকে বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেননি তাঁর স্বামী। লাভলীর দরিদ্র বাবা মান-সম্মানের ভয়ে মামলা-মোকদ্দমায় যাননি। বিয়ের ৭ মাস পর লাভলী যখন অন্তঃসত্ত্বা তখন তাঁকে পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়। বর্তমানে লাভলী ৪ ছেলে এবং ১ মেয়ের মা।

লাভলীর সংসার জীবনে কোনো সুখ ছিল না। স্বামী ঘরমুখী হওয়ায় বিয়ের খুব অল্প দিনের মধ্যেই তাঁকে রোজগারের জন্য মাঠে নামতে হয়। কাজ নিতে হয় দিনমজুরের। স্বামী বাড়িতে বেকার বসে থাকতেন। ১৯৯৭ সালে এসকেএস ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় তাঁর এলাকায় ২৭ জন হতদরিদ্র নারীকে নিয়ে একটি সমিতি গঠন করলে লাভলী তাঁর স্বভাব নেতার গুণে সেই দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। সমিতির মাধ্যমে লাভলী গরু মোটা-তাজাকরণ, বসতবাড়িতে সবজি চাষ ও হাঁস-মুরগি পালনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে সেই সমিতির মাধ্যমে লাভলী এসকেএস ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম থেকে ২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে একটি ছোট এঁড়ে বাছুর ক্রয় করেন। এটি ছিল লাভলীর সংসারে প্রথম বড় মাপের সম্পদ। গরু মোটাজাতাকরণের পাশাপাশি লাভলী তাঁর বসতবাড়িতে শাকসবজি ও হাঁস-মুরগি পালন শুরু করেন। বাড়িতে শাকসবজি ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে লাভলী তাঁর নিজের বাড়ির চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি বাজারে বিক্রি করে বেশ কিছু বাড়তি আয়ও করতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে গরুটা বিক্রি করে লাভলী একটি ধান ভাঙার মেশিন কিনে বাড়িতেই স্থাপন করেন এবং কিছু আবাদি জমি বন্ধক নেন। এতে লাভলীর কাজের পরিধি বাড়ার সাথে সাথে আয়ও বাড়তে থাকে। কৃষিকাজের পাশাপাশি অতিরিক্ত সময়ে তিনি ধান ভাঙার কাজ করে বাড়তি আয় করেন।

২০০১ সালে লাভলী বেগম একটি বেসরকারি সংস্থা থেকে ধাত্রীর প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাকায় গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা দিতে শুরু করেন। এদিকে এলাকায় একটি সংস্থার অধীনে বিনামূল্যে অপারেশনের মাধ্যমে ঠোঁটকাটা ব্যক্তিদের ঠোঁট জোড়া লাগানোর কাজ শুরু হলে লাভলী ঠোটকাঁটা ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করতেন এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এতে করে এলাকার মানুষের সাথে তাঁর একটা গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। বাড়ির চৌহদ্দি

পেরিয়ে বাড়ির বাইরে চলে আসেন লাভলী। এভাবে বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি হয় লাভলীর। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে লাভলী তাঁর এলাকার ২৫ জন দুঃস্থ নারীকে ভিজিডি কার্ড, ২৫ জনকে ভিজিএফ কার্ড, ৭ জনকে বয়স্ক ভাতা, ৫ জনকে বিধবা ভাতা, ৪ জনকে প্রতিবন্ধী ভাতা, ১২ জনকে মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং ৭ জনকে ১০০ দিনের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণে সহায়তা করেন। ২০০৫ সালে আরডিআরএস বাংলাদেশের অধীনে এলাকার ২২,০০০ নারী সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন ফেডারেশন কমিটি গঠন করা হয়, লাভলী সেই ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। এখানেও তিনি ১৯ জন নারীকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করেন। তাঁর নেতৃত্বে সেই ফেডারেশনের ব্যাংক হিসাবে প্রায় ৪ লাখ টাকা জমা রয়েছে। এই সঞ্চয়ের পেছনেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

২০০৯ সালে এসকেএস ফাউন্ডেশনের Integrated Livelihood Security (ILS) প্রকল্পের মাধ্যমে লাভলী ৪ জন নারীকে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ শেষে সেলাই মেশিন গ্রহণে সহায়তা করেন। এলাকার ১৩টি পরিবারকে সৌরবিদ্যুৎ প্রদান, ৩টি পরিবারকে নলকূপ, ১০টি পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনে সহায়তা করেন। ২৫ জনকে গরু মোটাতাজাকরণের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণে সহায়তার পাশাপাশি এসকেএস ফাউন্ডেশনের সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে ভেড়া ক্রয় করা বাবদ ২ জনকে ১০ হাজার টাকা নগদ প্রদানে সহায়তা করেন। নারীদের উন্নয়নের পাশাপাশি নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ ও বাল্যবিবাহ রোধেও তিনি ভূমিকা রাখেন। এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৫ জন ঝরেপড়া শিশুকে স্কুলগামী করার ক্ষেত্রেও তিনি সহায়তা করেন।

২০১৯ সালে এসকেএস ফাউন্ডেশনের Action for Socio-economic Security and Rights for Excluded and Marginalized Women and Girls (ASSR for EMWG) প্রকল্পের আওতায় তাঁর গ্রামে সুবিধাবঞ্চিত ২৫ জন নারীকে নিয়ে জবা নারীদলের সভাপতি নির্বাচিত হন লাভলী বেগম। এখানে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারীকে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে অংশগ্রহণ, নারীর অধিকার ও আইনের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণ পেয়ে উদ্বুদ্ধ লাভলী এলাকায় ৪টি বাল্যবিবাহ রোধ, ৭টির দেনমোহর আদায়, ২৪টি পারিবারিক বিরোধের মীমাংসা করেছেন। যৌতুক ছাড়া ৭টি বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

সমাজের উন্নয়নমূলক কাজে তাঁর অংশগ্রহণ, নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণে নিজকে নিয়োজিত করা, সর্বোপরি নিজের জীবনের শত নির্যাতন, প্রতিকূলতা পেরিয়ে সমাজের উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ লাভলী বেগম ২০২১ সালে উপজেলা পর্যায়ে জয়িতা সম্মাননা লাভ করেন।

সচেতনতাই মিনারার সাফল্যের সূচনা

মোছাঃ মিনারা বেগম, স্বামী- মোঃ জিল্লুর রহমান, পিতা- মোঃ মোজ্জাম্মেল হক, মাতা– মোছাঃ সুফিয়া বেগম লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলার খুনিয়াগাছ ইউনিয়নের শেখনাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। ১৪ বছর বয়সে বাবা-মা মিনারা বেগমের অমতে তাঁর বিয়ে দিয়ে দেন। মিনারা তখন নবম শ্রেণির ছাত্রী। বিয়ের পর আর লেখাপড়া হয় নাই। গ্রামের অন্যান্য বান্ধবীদের লেখাপড়া এবং সার্টিফিকেট-এর কথা শুনলে মনঃকষ্ট বেড়ে যায় মিনারা বেগমের। মনে মনে ভাবেন, "যদি বিয়ের বয়স হওয়ার পর আমার বিয়ে হতো, তাহলে আমার কিছু সার্টিফিকেট থাকতো বা আরও একটু লেখাপড়া করতে পারতাম। অন্যদের মতো চাকুরিও করতে পারতাম আমি।"

কম বয়সে বিয়ে। বিয়ের এক বছর পরেই সন্তান গ্রহণ এবং অল্প বয়সেই ২ সন্তানের মা হয়ে যাওয়া। দুটি সন্তানই লেখাপড়া করে; তবে খুব কষ্টের মধ্য দিয়ে। কষ্টের কারণ হিসেবে মিনারা বলেন, "স্বামীর বাড়ি নদীর পাশে যখন বন্যা হয় তখন তো নদীর পাড় ভাঙ্গে। পাড় ভাঙতে ভাঙতে বাড়ির সীমানায় চলে আসে। যখন নদীর পানি কমে যায়, তখন আবার মাটি ভরাট করতে হয়; যাতে বাড়িটা ভেঙ্গে না পড়ে।" শত কষ্টের মধ্যেও দুই সন্তানকে লেখাপড়া করানোর আগ্রহ কমেনা তাঁদের। কারণ মিনারার স্বামীরও লেখাপড়া নাই। এমনকি তিনি নিজের নামটাও লিখতে পারেন না। সেই কষ্টও মিনারাকে তাড়া করে।

২০১৬ সালে ActionAid বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় এসকেএস ফাউন্ডেশন লালমনিরহাট সদর উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি বিশেষ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। প্রকল্পের আওতায় মিনারা বেগমের বাড়ির পাশে ২৫ সদস্যের একটি নারীদল গঠন করা হয়। পর্যায়ক্রমে খুনিয়াগাছ ইউনিয়নে ২০টি নারীদল গঠন করা হয়। ২০টি দলের অংশগ্রহণে গঠিত হয় একটি ফেডারেশন। সদস্যদের অংশগ্রহণে সিদ্ধান্ত হয় দলগুলো ফেডারেশন হিসাবে নিয়মিত একটি স্থানে সভা করবে। সভার জন্য ফেডারেশনের একটি ঘর থাকবে, যেখানে সকল সদস্য তাদের মতামতসহ সমস্যার কথা আলোচনা করবেন এবং সমাধানের পথ খুঁজে বের করবেন। সদস্যদের চাহিদা ও পছন্দ অনুযায়ী ফেডারেশনের একটি ঘর করা হয়। সেখানে সকল সদস্যগণ নিয়মিত সভা আয়োজন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন।

ফেডারেশনের সকল সদস্য মিলে একত্র বসার সুযোগে অনেক সদস্য তাদের জীবনের গতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে উৎসাহিত হন। যে কোন বিষয়

নিয়ে আলোচনা করে নিজেরাই পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেন। অনেকের মধ্যে মিনারা পূর্ণ আগ্রহ নিয়ে সামাজিক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে না পারলেও যেটুকু জানা ছিলো তাই দিয়ে দলের সভা পরিচালনা, হিসাব পরিচালনা, সভা, সালিশী আয়োজন করে ঘটনার মীমাংসা করতে সহায়তা করেন। এছাড়াও তিনি গ্রামীণ পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেন। তাঁর এই ধরনের ভূমিকার জন্য সমাজে তাঁর সম্মান এবং মর্যাদা বৃদ্ধি হতে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কমিটিতে মিনারাকে সদস্য হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে।

ActionAid বাংলাদেশ এবং এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর বাস্তবায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে মিনারা বিভিন্ন ধরণের দক্ষতা উন্নয়ন ও জীবন পরিচালনামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেন। মিনারা অন্যান্য নারী সদস্যদের সাথে নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদকে অবগত অথবা কোন কোন সময় তাদেরকেও সাথে নিয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন সচেতনতা ও প্রতিবাদমূলক কার্যক্রম আয়োজন ও বাস্তবায়ন করেন। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধেও বিভিন্ন ধরণের প্রচারণা ও বাল্যবিবাহ বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিতকরণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত নারীকে ও তার পরিবারকে প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা পেতে সহায়তা করেন। মিনারা বেগম সরকারি সেবার হটলাইন ৯৯৯ এবং ১০৯ ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজে সংঘটিত নারীদের স্বার্থ সংবলিত বিভিন্ন ঘটনার তথ্য প্রশাসনকে জানান। পাশাপাশি দল ও ফেডারেশনের মিটিংয়ে বিভিন্ন সমস্যা এবং কার্যক্রম নিয়ে কার্যকরী আলোচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

নারী ফেডারেশনের সভাপতি হয়েও পাশাপাশি মিনারা ব্র্যাক স্বাস্থ্য সেবিকা হিসাবেও কাজ করেন। তিনি এসকেএস কর্তৃক বাস্তবায়িত পাওয়ার প্রকল্পের শিক্ষানবিশ হিসাবে ও কাজ করেন। মিনারা বলেন, "বিবাহের পরবর্তী সময়ে আমার পরিবারের আয় ছিল খুবই সামান্য। সন্তানদের লেখাপড়া করানো এবং ভালোভাবে দু-বেলা খাবার জুটতো না। কিন্তু এখন নানামুখী কাজের সাথে যুক্ত হতে পেরে আমার আয় বেড়েছে। পাওয়ার প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করতে পেরেছি, সেই সাথে আমি আরও বলতে চাই 'একটি বাড়িএকটি খামার'- এর সদস্য হিসাবে আমি আয়-বর্ধনমূলক কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছি। আমি ও আমার পরিবার এখন সুখে আছি, আয় বেড়েছে এবং সমাজে মর্যাদাও বেড়েছে। সেই সাথে আমার সন্তানরাও সুন্দরভাবে লেখাপড়া করতে পারছে।" জীবনযুদ্ধে সাফল্যের জন্য তাঁকে ২০২১ সালে জয়িতা সম্মান প্রদান করা হয়।

সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদানে ফাতেমার জয়িতা জয়

ফাতেমা বেগম, স্বামী– মোঃ শহিদুল ইসলাম, বাস করেন গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সুবর্ণদহ গ্রামে। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে সমাজে অধিকারবঞ্চিত অসহায় দারিদ্র্যপীড়িত ও নির্যাতনের শিকার নারীদের অধিকার রক্ষা, যৌন হয়রানি, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধে সশরীরে কাজ করে যাচ্ছেন ফাতেমা। যৌতুকের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য স্ব-উদ্যোগে তৃণমূল পর্যায়ে আন্দোলন করেছেন। তিনি গ্রামের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি ও উপবৃত্তি পেতে সহযোগিতা করেছেন। ফাতেমা বেগম বেআইনি তালাক ও বেআইনি সালিশ বন্ধে গ্রামের স্থানীয় নেতাদের বুঝিয়ে অনেক নারীর সংসার-ভাঙন প্রতিরোধ করেছেন।

ফাতেমা নারীদের শারীরিক ও পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে দলবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ফাতেমা পাশের বাড়ির দুই দম্পতিসহ (মোছাঃ হাদিকা বেগম ও শফিকুল ইসলাম, এবং মোছাঃ নাজমা বেগম ও নজরুল ইসলাম) অনেকের তালাক প্রতিরোধ করেছেন। বর্তমানে তারা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছেন। ফাতেমা বেগম কমপক্ষে ১৫টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকে এখন বিয়ের পিঁড়ি থেকে ফিরে আবারও লেখাপড়া করছে। ফাতেমা বেগম বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কমিটিতে আছেন এবং সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখছেন। সমাজের যে-কোনো ধরনের সমস্যা হলে তিনি সমাধানের চেষ্টা করে থাকেন। তাঁর সততা, পরোপকারিতা, কাজ করার আন্তরিকতা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে এলাকার সাধারণ মানুষ, বিশেষকরে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ সম্মিলিতভাবে তাঁকে রামজীবন ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত নারী আসনে সদস্য হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের উৎসাহ প্রদান এবং সহযোগিতা করেন। ফাতেমা বেগম ২০১৬ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের একজন মহিলা সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন এবং অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

ফাতেমা বেগম ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সরকারি, বেসরকারি যে সুযোগ-সুবিধা আসে সেগুলো এলাকার অসহায় মানুষের মাঝে স্বচ্ছভাবে বিতরণ করেন। ফাতেমা বেগম বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, হিল্লা বিবাহ বন্ধ, বেআইনি তালাক, বেআইনি সালিশ বন্ধ, ছেলেমেয়েদের শতভাগ জন্মনিবন্ধন, মৃত্যুনিবন্ধন, নিরাপদ পানি পানের জন্য নলকূপের গোড়া পাকাকরণ, শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে এলাকার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছেন। সমাজের কারও কোনো সমস্যা হলে প্রথম যে মানুষটা ছুটে যান তিনি হলেন ফাতেমা বেগম। সুখে-দুঃখে মানুষের পাশে থাকেন। গ্রামের বিভিন্ন সালিশে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং কার্যকরী

মতামত প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করেন। তিনি নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে এলাকার নারীদের স্বাবলম্বী করতে নানা পরামর্শ দিয়ে আসছেন।

স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধসহ পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিরসনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সমাজে অধিকারবঞ্চিত নারীদের অধিকার রক্ষায় এলাকার মানুষকে একতাবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছেন এবং সমাজ উন্নয়নে একজন অসামান্য নারী নেত্রী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। পাশাপাশি ফাতেমা বেগম এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর Making Market Work for Women (MMWW) প্রকল্পের সুবর্ণদহ বহুমুখী কৃষি উন্নয়ন দলের একজন খামার ব্যবসায়ী উপদেষ্টা (Farm Business Advisor) এবং তিনি দক্ষতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন।

সামাজিক আন্দোলনের কাজে তাঁর এই অসামান্য অবদানের জন্য সুন্দরগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০২০ সালে ফাতেমা বেগমকে জয়িতা সম্মাননায় ভূষিত করেন। তাঁর এই সম্মাননায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এলাকার অন্য নারীরাও উৎসাহবোধ করে নিজেদেরকে প্রতিবাদী করতে সাহস পাচ্ছেন।

অর্থনৈতিক সফলতায় শাপলা বেগমের জয়িতা অর্জন

মোছাঃ শাপলা বেগম ও মোঃ শাহিন মিয়া দম্পতি গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নের পুটিমারী গ্রামের বাসিন্দা। ২০১৫ সালের ২৬ নভেম্বর খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয় শাপলা এবং শাহিন দম্পতির; তাদের তখন বয়স ছিল যথাক্রমে ১৫ এবং ১৮ বছর। এইচএসসি পাশ স্বামী ভাড়ায় রিক্সা চালিয়ে সংসার চালাতেন। কিন্তু ভাড়ায় রিক্সা চালিয়ে শাহিনের একার রোজগারে সংসার চলছিল না। তাই তারা দুজনই ২০১৬ সালে ঢাকায় গিয়ে গার্মেন্টেসে অল্প বেতনে চাকুরি শুরু করেন। সেখানেও তাদের দুজনের আয়ে বাসা ভাড়া দিয়ে সংসার চালানো কষ্টকর হচ্ছিল। ভালো কাজের আশায় প্রায় দুই বছর ঢাকায় ছিল শাপলা দম্পতি; কিন্তু সুবিধা করতে পারেননি। তাই ২০১৮ সালে তারা আবার গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন। গ্রামে ফিরে শাহিন আগের মতো রিক্সা চালাতে শুরু করেন। এর মধ্যে তাদের পরিবারে জন্ম নেয় একটি কন্যাসন্তান।

পরিবারের সদস্য বাড়ায় সংসারের খরচও বেড়ে যায় একটু। দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত নেন, ঢাকায় পোশাক তৈরির কারখানায় কাজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সেলাইয়ের পাশাপাশি কাপড়ের ব্যবসা করবেন। শাপলা বলেন, "ঠিক করলাম, আমি ঘরে বসে সেলাই মেশিনে পোশাক বানাব আর আমার স্বামী সেগুলো বাজারে বিক্রি করবেন। এতে হয়তো নিজেদের উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।" কিন্তু তখনও শাপলা সেলাইয়ের কাজে তেমন দক্ষ নন। তাছাড়া, একটি সেলাই মেশিনও প্রয়োজন। তাদের হাতে সে পরিমাণ টাকাও ছিল না। বাড়িতে পালা মুরগি বিক্রি করে প্রায় ৫,০০০ টাকা পান শাপলা। সেই টাকা থেকে ১,০০০ টাকা দিয়ে পাশের গ্রামে একজন দর্জির কাছে দর্জি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং ২,৮০০ টাকা দিয়ে একটি ছাগল ক্রয় করেন। ছয় মাসের মধ্যে ছাগলটির ২টি বাচ্চা হয়। বাচ্চা দুটি বড় হলে একটি রেখে মা'সহ ১টি বাচ্চা ৫,০০০ টাকায় বিক্রি করে একটি সেলাই মেশিন কেনেন। শুরু হয় তাদের ব্যবসা। দিন দিন তাদের ব্যবসার উন্নতি হতে শুরু করে।

২০১৯ সালে শাপলা বেগম এসকেএস ফাউন্ডেশনের নারীদলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। নিজের কাজের পাশাপাশি কর্মসূচির বিভিন্ন মিটিং এবং সেশনে নিয়মিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে শাপলা পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। পাশাপাশি দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন। বাড়তি কিছু আয় রোজগার দিয়ে ভালোই চলছিল তাদের। কিন্তু ২০২০ সালে করোনা মহামারিতে পড়ে তাদের কাপড়ের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। ব্যবসা হারিয়ে হতাশায় পড়েন তারা। বছরের মাঝামাঝি সময়ে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত সদস্য হিসেবে এসকেএস- এর পক্ষ থেকে সহায়তা হিসাবে ৭,০০০ টাকা পান শাপলা। এই টাকা দিয়ে তিনি পুনরায় কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। থামতে হয়নি আর।

শাপলার বাসায় এখন শুধু কাপড়ই আছে প্রায় লক্ষ টাকার। গ্রামে ও বাজারে কাপড় বিক্রির জন্য এরই মধ্যে নিজস্ব একটি অটোভ্যান কিনেছেন তিনি। বাড়িতে একটি কারখানা ঘর তৈরি করেছেন; যেখানে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ডিজাইনের পোশাক তৈরি হচ্ছে। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পোশাক তৈরির জন্য কারখানায় একজন দক্ষ কারিগরও নিয়োগ করেছেন তারা। সব খরচ বাদ দিয়ে এখন মাসে প্রায় ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা আয়। ১০ শতক আবাদি জমি বর্গা নিয়েছেন; যেখানে বিভিন্ন ধরনের ফসলের চাষ করছেন। শাপলা এখন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী এবং তাদের ব্যবসার আরও প্রসার ঘটছে। এই সাফল্যকে কেন্দ্র করে ২০২১ সালে সাঘাটা উপজেলায় অর্থনৈতিকভাবে সফল একজন নারী হিসেবে শাপলা বেগম জয়িতা সম্মাননা লাভ করেন।

নির্যাতনের বিভীষিকা দূরে ঠেলে বেলী এখন স্বভাব নেতা

বেলী বেগম। গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার, গজারিয়া ইউনিয়নের কাতলামারী গ্রামের বাসিন্দা এক অতি দরিদ্র দিনমজুর পরিবারের সন্তান। ছোটবেলা থেকেই বন্যা, নদীভাঙন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই তাঁর বেড়ে ওঠা। সংসারের অভাব-অনটনের কারণে মেধাবী ছাত্রী হয়েও অষ্টম শ্রেণির গণ্ডি পেরিয়ে আর এগোতে পারেননি। বিয়ের দুবছর পর ২০০১ সালে মারা যায় তাঁর বাবা। পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়ে। অন্যদিকে শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে ৫০,০০০ টাকা যৌতুকের চাপ আসতে থাকে। বেলীর মা এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে ২০,০০০ টাকা যৌতুক দিলেও শ্বশুরবাড়ির চাহিদা মেটে না। দাবি আরো বেশি। ফলাফল, তাঁর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। দুবেলা খাবার দেওয়াও বন্ধ। বাবার মৃত্যুশোক এবং শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে দিশেহারা বেলী মেয়েসহ আত্মহননের চেষ্টা চালান। ২০০৭ সালে এক অন্ধকার রাতে রেললাইনে হাজির হয়ে যান তিনি। ভাগ্য সহায়, এক অপরিচিত বৃদ্ধা তাঁকে রক্ষা করে নিয়ে যান নিজের বাড়িতে। বৃদ্ধার উপদেশ, পরামর্শে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ে বেলী ফিরে আসেন বাড়ি।

শুরু হয় বেঁচে থাকার সংগ্রাম। গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদে যোগাযোগ করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অওতায় চল্লিশ দিনের কর্মসূচিতে নাম লেখান বেলী। এর পরপরই এক বন্ধুর সহায়তায় এসকেএস ফাউণ্ডেশনের আয়োজনে ৩০ দিনের সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে পেয়ে যান একটি সেলাই মেশিনও। শুরু হয় দর্জি কাজ। পরিচিত হতে থাকেন একজন দক্ষ দর্জি হিসেবে। বাড়তে থাকে আয় রোজগার। ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে এসকেএস ফাউণ্ডেশনের Promoting Opportunities for Women's Empowerment and Rights (POWER) প্রকল্পের আওতায় বেলী যুক্ত হন কাতলামারী গ্রামের প্রজাপতি নারীদলের সাথে। দল থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অসহায় নারীদের জন্য কিছু করার তাড়না বোধ করেন। এসব চেষ্টার সূত্র ধরে বেলীর পরিচিতি আরও বাড়তে থাকে ।

নিজের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের শক্তি থেকেই বেলী নির্যাতিত, অসহায়, দুঃস্থ নারীদের জন্য কিছু করার তাগিদ বোধ করেন। বিভিন্ন সংস্থার সাপ্তাহিক ও মাসিক সভার মাধ্যমে বেলী স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর সেবা প্রদানের তথ্য জনগণকে জানাতে থাকেন। নিজেকে সংযুক্ত করেন ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হিসেবে। গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ও মহামারি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হয়ে অসহায় নারীদের জন্য সেবা-সহায়তার ব্যবস্থা করতে থাকেন। এভাবে বেলী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একজন সমাজসেবক হিসেবে। হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত

নারীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেন বেলী। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সাথে নিয়ে যোগাযোগ করেন এলাকার সাংসদ ও ডেপুটি স্পিকার, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে। ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ পেয়েও যান গ্রামীণ অসহায় মানুষের জন্য। বেলীর নেতৃত্বে ও গ্রামের মানুষের সহায়তায় যাত্রা শুরু করে গজারিয়া ইউনিয়নের কমিউনিটি ক্লিনিক।

গ্রাম এবং আশপাশের মানুষের সাথে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন ও সম্মিলিত পদক্ষেপের মাধ্যমে বেলী বেগম ৭৫টি ভিজিডি কার্ড, ২০০টি ভিজিএফ কার্ড, ১৪টি বয়স্ক ভাতা, ২৬টি বিধবা ভাতা, ৮টি মাতৃত্বকালীন ভাতা গরিব-দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। পাশাপাশি গ্রামের অসহায় নারীরা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছেন। প্রশিক্ষণের মধ্যে ৩২ জন বিআরডিবি থেকে তিন মাসের সেলাই প্রশিক্ষণ, ১৮ জন মহিলা ও শিশুবিষয়ক বিভাগ থেকে তিন মাসের সেলাই প্রশিক্ষণ, ১২ জন ব্লক ও বুটিক প্রশিক্ষণ এবং ১২ জন কিশোরী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত ২৭টি পরিবার সোলার হোম প্যানেল সহায়তা পেয়েছেন এবং ৩২টি নলকূপ মেরামত এবং ১২টি নতুন নলকূপ স্থাপন সম্ভব হয়েছে।

বেলী বেগমের নেতৃত্বে এসকেএস ফাউন্ডেশনের POWER প্রকল্পের গজারিয়া ফেডারেশন স্থানীয় সাংসদ ও ডেপুটি স্পিকারের সহায়তা তহবিল থেকে ফেডারেশন ভবনের জমি ক্রয়ের জন্য ৫,০০০ টাকা, কঞ্চিপাড়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের জন্য ৫,০০০ টাকা এবং উড়িয়া ফেডারেশনের জন্য অনুদান সংগ্রহ করেছে। বেলী বেগমের নেতৃত্বে স্থানীয় নারী ফেডারেশনের সদস্যরা ৫টি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছেন এবং মানুষকে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে গ্রামকে বাল্যবিবাহমুক্ত ঘোষণা করেছেন। ১০০টি অতিদরিদ্র পরিবার কোনো ফি ছাড়াই তাদের জন্মনিবন্ধন সনদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন।

তিনি স্থানীয় জামিল আক্তার উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে ১,৪০০ টাকার স্থলে শুধু সরকার-নির্ধারিত ফি ৪০০ টাকাতেই ৪০০ শিক্ষার্থীকে ভর্তি হতে সহায়তা করেছেন।

সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে বেলী বেগম একজন সমাজসেবক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় নারীদের অধিকার, ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সেবার নিয়মাবলি উপস্থাপনে বেলী বেগমের দখল এলাকায় যথেষ্ট প্রশংসিত। এলাকার কোনো মানুষ নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হলে বেলী বেগমের সহায়তা প্রত্যাশা করে। যে শ্বশুরবাড়ির লোকজন বেলীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতো আজ তাদের কোনো আত্মীয়স্বজন নির্যাতনের শিকার হলে বা অধিকারবঞ্চিত হলে বেলী বেগমের কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁর উপস্থাপন দক্ষতা, নারীদের সাথে সম্পর্ক, এলাকার দুঃস্থ নারীদের অধিকার বিষয়ে সোচ্চার মনোভাব ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর প্রতিভার কারণে বেলী বেগম এলাকার নারীনেত্রী হিসেবে একটি রাজনৈতিক দলের সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছেন। সবাই বেলী বেগমের কাজের প্রশংসা করে; বিশেষকরে, গ্রামের নারীদের জীবন সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা অনন্য।

বেলী বেগম গজারিয়া ফেডারেশনের সভাপতি। বেলীর স্বপ্ন তাঁর এলাকার ২০টি নারী দলের জন্য একটি স্থায়ী অফিস নির্মাণ করা। অফিস নির্মাণ করার জন্য তিনি ২০টি নারীদলের ৫০০ সদস্যের নিকট থেকে কিছু অর্থ সহায়তা নিয়ে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার তহবিল গঠন করেন। নারীদের জন্য ৪ শতক জমি ক্রয় করে ফেডারেশন অফিস নির্মাণ করেছেন। নির্মিত অফিসে বসেই এলাকার স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, পরিবার পরিকল্পনা, দুর্যোগ মোকাবিলা, নারী নির্যাতন, বিচার-সালিশ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করায় বেলী বেগমের সংসারের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় ও সম্পদের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরিবারে একজন অপরিহার্য সদস্য হিসেবে গণ্য হয়েছেন। সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পরিবারের পক্ষ থেকে কোন প্রকার বাধা নেই আর। বেলী বেগমকে দেখে গ্রামের আরও অনেক নারী সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করছেন। ফলে এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, স্যানিটেশন, পরিবার পরিকল্পনা সেবার প্রসার ঘটেছে। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকছে, বাল্যবিবাহ শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে, যৌতুকের ঘটনা নেই বললেই চলে, পারিবারিক নির্যাতন কমে গেছে এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় এলাকার মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসবের পেছনে বেলী বেগমের নেতৃত্বদানের ফলস্বরূপ ২০১৮ সালে উপজেলা পর্যায়ে বেলী বেগম জয়িতা পুরস্কারে ভূষিত হন। এই সম্মাননা বেলী বেগমের আগামীর পথচলাকে উৎসাহিত করছে।

সংগ্রামী আসমা পেলেন জয়িতা সম্মাননা

মোছাঃ আসমা বেগম। গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়নের দক্ষিণ হরিণসিংহা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি তাঁর এলাকার একজন সংগ্রামী ও সাহসী নারী। নিজে সংগ্রাম করেছেন, সাহস দেখিয়েছেন নারীর অধিকার আদায়ে। সংগ্রাম ও সাহস দুটোই আসমাকে দিয়েছে সমাজকর্মীর পরিচিতি। তাঁর অনবদ্য সমাজকর্মের জন্য ২০২১ সালের ৯ ডিসেম্বর তাঁকে জেলা ও উপজেলা দুটি পর্যায়ে জয়িতা সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

বাবা মোঃ ফজলার রহমান এবং মা মোছাঃ সালেহা বেগম। ৬ বোন এবং ৬ ভাইয়ের মধ্যে ১১তম আসমা। বড় ভাইবোনদের বিয়ের পর আসমা, তাঁর ছোট ভাই ও বাবা-মাকে নিয়ে ছিল তাদের সংসার। জমিতে কৃষিকাজ করেই বাবা সংসার চালাতেন। কিন্তু ১৯৮৬ সালে বাবা পঙ্গু হয়ে পড়লে আসমার জীবনে হঠাৎ ছন্দ পতন, নেমে আসে অন্ধকার। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৯ বছর। সেই অবস্থায় আসমা পড়াশোনার পাশাপাশি বাড়ির পাশে বিড়ি ফ্যাক্টরিতে কাজ করে পরিবারকে সহায়তা করতে থাকেন। কিন্তু মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আসমার বাবা তাঁকে বিয়ে দেন। আসমার বয়স তখন ১২। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়তেন। গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের তিনদহ গ্রামের মোঃ হামিদুল ইসলাম এবং মোছাঃ নাছিমা বেগমের একমাত্র সন্তান মোঃ সাইদুল মিয়ার সাথে ১৯৮৯ সালে বিয়ে হয়ে যায় আসমার।

স্বামী সাইদুলের বয়স তখন আঠারো এবং তিনি ছিলেন মা'ভক্ত। দিনমজুরের কাজ করে স্বামী তার আয়ের পুরো টাকা মায়ের হাতে তুলে দিতেন; আসমাকে কোনো ভরণপোষণ দিতেন না। ননদ তাঁকে পছন্দ করতেন না; আসমার বিরুদ্ধে শাশুড়িকে বিভিন্ন কথা বলে শাশুড়ির কান ভারী করতেন। এভাবে শাশুড়ি ও ননদ দুজনে মিলে তাঁকে অত্যাচার করতেন, মারধর করতেন। অত্যাচারের কারণে আসমা প্রায়ই বাবার বাড়িতে চলে আসতেন। স্বামী তাঁকে বুঝিয়ে আবার বাড়িতে নিয়ে আসতেন। এরই মধ্যে ১৯৯০ সালে আসমার প্রথম মেয়েসন্তানের জন্ম হয়। এর কয়েকমাস পর স্ত্রীকে সন্তানসম্ভবা রেখে আসমার স্বামী বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। পরে আসমার ছেলেসন্তান হলে ছেলেসন্তানকে দেখার জন্য তাঁর স্বামী বাড়ি ফিরে আসেন। জানা যায়, আসমার স্বামী আরেকটি বিয়ে করে অন্যত্র ছিলেন।

তবুও শাশুড়ি-ননদের অত্যাচার থামে না। শাশুড়ি-ননদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আসমা ২০০০ সালে স্বামী-সন্তানসহ ঢাকায় চলে যান। সেখানে আসমা

মানুষের বাসায় কাজ করতেন এবং স্বামী চালাতেন রিক্সা। কিন্তু কিছুদিন পর শ্বশুর-শাশুড়ি ঢাকায় গিয়ে তাদের কাছে আশ্রয় নেন এবং সেখানেও তাঁর ওপর বিভিন্নভাবে অত্যাচার করতে থাকেন।

এরপর আসমা ২০০১ সালে স্বামী-সন্তান নিয়ে দিনাজপুরে তাঁর বড় বোনের বাড়িতে ওঠেন এবং সেখানেই কাঁথা সেলাইয়ের কাজ করতে শুরু করেন। পাশাপাশি স্বামী রিক্সা চালাতেন। ২০০২ সালে আসমা দিনাজপুরে রাস্তা থেকে দশ টাকার একটা লটারির টিকেট ক্রয় করেন, ভাগ্যক্রমে সেই লটারি জিতে তিনি ২২,০০০ টাকা পেয়ে যান। এই টাকার খবর পেয়ে আসমার বড় ভাই তাঁকে গ্রামের বাড়িতে বাড়ি তৈরির জন্য দুই শতক জমি দেয়ার লোভ দেখিয়ে সেই ২২,০০০ টাকা হাতিয়ে নেয়। ভাইয়ের প্রতিশ্রুতিতে স্বামী-সন্তাসহ দিনাজপুর থেকে ২০০৩ সালে গাইবান্ধার গ্রামের বাড়িতে আসেন আসমা। যথারীতি ভাইয়ের দেয়া জমিতে ঘর তৈরি করে বসবাস করতে থাকেন তাঁরা। এভাবে ৩-৪ বছর পার হয়ে যায়। তাঁর স্বামী মাঠে দিনমজুরের কাজ করতে থাকেন। মাঠে কাজ করা অবস্থায় ২০০৩ সালে আসমা একটি বেসরকারি সংস্থায় গ্রাম্য সেবিকা হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান। এরপর তাঁকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। গ্রাম্য সেবিকার প্রশিক্ষণ নিয়ে তাঁর প্রথম সেবাটা পেলেন তাঁরই প্রতিবেশী এক চাচা। চাচাকে সেবা-শুশ্রূষা ও ওষুধ দিয়ে সুস্থ করে তোলেন আসমা। নিজের প্রতি আস্থাবান হন আসমা।

একসময় আসমা বেগমকে তাঁর ভাই-ভাবি অত্যাচার শুরু করেন এবং বাড়ি থেকে বের করে দেন। আসমার বসতভিটা তাঁর ভাই-ভাবি তাঁদের দুই ছেলের নামে লিখে দেন। নিরুপায় হয়ে আসমা ভাইয়ের বাড়ির পাশে ত্রিমোহনী স্টেশনের সরকারি জমিতে গিয়ে ওঠেন; ছোট্ট একটি ঘর তুলে বাস করতে শুরু করেন। আসমা এবার নিজেকে একজন অন্যায়ের প্রতিবাদী নারী হিসেবে বিভিন্ন আইনকানুন ও তার প্রতিকার সম্পর্কে জানার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরই মধ্যে ২০১৯ সালে এসকেএস ফাউন্ডেশনের Action for Socio-economic Security and Rights for Excluded and Marginalized Women and Girls (ASSR for EMWG) প্রকল্পের কার্যক্রম এলাকায় বাস্তবায়ন শুরু হলে আসমা বেগম ময়ূর নারী দলের সদস্য হিসেবে যোগ দেন এবং নারী ও শিশুর প্রতি নির্যাতন রোধ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণে নারীর অধিকার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারেন। নিজেকে যুক্ত করেন এলাকার অবহেলিত নারীদের আইনি সহায়তা পাইয়ে দেয়ার কাজে।

তাঁর এই সাহস ও পরিচিতির পেছনে একটি ঘটনা রয়েছে। গরিব মানুষ হিসেবে এরই মধ্যে আসমা বেগম রেশনের কার্ড পান। কিন্তু কয়েক মাস পর তাঁর ও আরো কয়েক জন নারীর রেশন কার্ড কৌশলে এবং স্থানীয় মেম্বারের ইঙ্গিতে ডিলার সরিয়ে ফেলেন এবং তাঁকে রেশন থেকে বঞ্চিত করেন। এর প্রতিকার পাওয়ার জন্য আসমা প্রথমে স্থানীয় মেম্বার, পরে নারী মেম্বার ও চেয়ারম্যানের কাছে যান। কিন্তু কেউই তাঁর কথা শুনেন না। সৌভাগ্যবশত প্রশিক্ষণের সূত্র ধরে আসমা এরই মধ্যে পরিচিত স্থানীয় এক সাংবাদিকের কাছে জেনে নেন, কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাঁর কোনো বিপদ হবে কি না। সাংবাদিক তাঁকে অভয় দিলে আসমা সাংবাদিকের মোবাইল নম্বর নিয়ে রাখেন। এরপর সেই রেশন কার্ডের চাল বিতরণের দিন আসমা প্রথমে সংশ্লিষ্ট ডিলারের কাছে তাঁর কার্ড ফেরত চান। কিন্তু বিতরণকারীরা তাঁকে সেখান থেকে বের করে দেন। তিনি পুনরায় একটি চালের বস্তা আনতে গেলে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়। এতে আসমা ঐ সাংবাদিককে ফোন করেন। সাংবাদিক তাঁকে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং থানার ওসির নম্বর দেন। আসমা ফোন করে তাঁর ও বঞ্চিত কার্ডধারী অন্যান্য নারীদের কথা জানালে ইউএনও এবং ওসি সেখানে চলে আসেন। সেখান থেকে পালিয়ে যান মেম্বার এবং অন্যান্যরা। পরে চাল আত্মসাতের অভিযোগে মেম্বার ও চেয়ারম্যানের শাস্তি হলে এলাকার লোকেরা আসমার সাহসের প্রশংসা করেন। এ ছাড়া তাঁর বাড়ির পাশে জুয়া খেলার জের ধরে দুষ্টচক্র তাঁর বাড়িতে হামলা করলে আসমা আইনের আশ্রয় নিয়ে তাদের শাস্তি নিশ্চিত করেন।

এই ঘটনা তাঁকে এলাকায় অবহেলিত নারীদের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচিতি করিয়েছে। এই পরিচিতির পাশাপাশি আসমা এসকেএস ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে তাঁর নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। এখন তিনি বাড়িতে কবুতর, হাঁস-মুরগি ও গাভী পালন করেন। আসমা বলেন, “এই পর্যন্ত আমি ২২টি পারিবারিক সমস্যার সমাধান করেছি। তাঁরা এখন সুখে আছেন, ঘর-সংসার করছেন। এলাকার ২টি বিয়ে বিচ্ছেদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিয়েছি। ২টি বাল্যবিবাহ রোধ করেছি। এলাকায় বিয়ে সংক্রান্ত কোনো ধরণের সমস্যা হলে নারীরা এখন আমার কাছে ছুটে আসেন। আমি এখন তাদের ভরসার স্থল। যে ইউনিয়ন পরিষদ আমাকে পাত্তা দিত না, সেই ইউনিয়ন পরিষদ নারীদের যে-কোনো সমস্যায় আমাকে ডাকে। আমি সকলের আস্থা অর্জন করতে পেরেছি। এখন আমাকে সকলে সম্মান করেন। এটাই আমার জয়।”

অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী মোসলেমার জয়িতা স্বীকৃতি

গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বেলকা ইউনিয়নে মধ্য বেলকা উত্তর গ্রামে বসবাস করেন মোছাঃ মোসলেমা বেগম। গ্রামটি প্রতি বছর বন্যায় প্লাবিত হয়। মাত্র ১৬ বছরে মোসলেমার বিয়ে হয় মোঃ এমদাদুল হোসেন-এর সাথে। বিয়ের পর তাঁর শ্বশুরবাড়িতে মাথা গোঁজার মতো ঠাঁই ছিল না। বাঁধের ধারে কোন রকমে খাস জমিতে বসবাস করতেন। ১ ছেলে ও ১ মেয়ে নিয়ে শাশুড়িসহ মোট ৫ জনের পরিবার। তাঁর স্বামী রাজ মিস্ত্রির কাজ সাথে লেবারের কাজ করে কোন রকমে সংসার চালান। দিনে একবেলা খেয়ে অন্য বেলা না খেয়েও জীবন বাঁচান। এরই মধ্যে ২০১৭ সালের জুন মাসে সরকারিভাবে নির্দেশনা আসে যে, বাঁধ ভেঙে নতুন করে মেরামত করা হবে। তাই সকল অবৈধ বাসিন্দার জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু থাকবে না ভেবে তিনি তখন দিশেহারা হয়ে পড়েন। এমন সময় এসকেএস ফাউন্ডেশনের সৌহার্দ-৩ কর্মসূচিভূক্ত এক সদস্যের সাথে পরিচয় হয় মোসলেমার। তিনি বিষয়টি নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করেন। একটু সুযোগ-সুবিধা পেলে মোসলেমা তাঁর পরিবার নিয়ে ঘুরে দাড়ানোর দৃঢ়তা ব্যক্ত করেন।

কিছুদিন পর সৌহার্দ্য-৩ কর্মসূচির আওতায় তিনি ৩০ দিনের একটি সেলাই প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। তিনি খুবই গুরুত্ব সহকারে প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি ৪,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা পান। নিজের কিছু জমানো টাকা যোগ করে মোসলেমা একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। মেশিন কেনার পর তিনি দর্জির কাজ শুরু করেন। প্রথমে তিনি প্রতিবেশীদের কাছ থেকে নামমাত্র মজুরি নিয়ে কাজ করতেন। ধীরে ধীরে তিনি দক্ষ দর্জি হয়ে ওঠেন এবং গড়ে প্রতিদিন ৩০০ টাকা আয় করেন। মোসলেমার স্বামীর জমানো টাকা দিয়ে প্রথমে তিনি ৫ শতাংশ জমি ক্রয় করেন বাড়ি করার জন্য। পরবর্তীতে তিনি সেলাই-এর কাজের পাশাপাশি বাড়িতে ৩টি ছাগল, ২টি গরু এবং ১৫টি হাঁস-মুরগি পালন করেন। বর্তমানে টিনের ঘরের পরিবর্তে পাকা বাড়ি করেছেন এবং তিনি ২ বিঘা জমি বন্ধক নিয়েছেন। তাঁর এই কাজের সফলতা দেখে গ্রামের অন্যান্য প্রতিবেশীও তাঁর কাছ থেকে দর্জি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন, যার মাধ্যমে তিনি বাড়তি কিছু আয় করছেন। বর্তমানের মোসলেমা বেগম দর্জির কাজ করে মাসে প্রায় ৮,০০০ টাকা আয় করছেন এবং তিনি একজন সফল দর্জি হিসেবে এলাকায় পরিচিতি

লাভ করেছেন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হয়ে সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। হত-দরিদ্র পরিবারের অধিকার আদায়ে মোসলেমা এখন একজন সাহসী আত্মবিশ্বাসী নারী।

মোসলেমার স্বপ্ন ছেলেমেয়েকে পড়াশনা করাবেন এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজের সচেতন মানুষ হিসেবে পরিচিত করাবেন। নিজের মতো মেয়েকে বাল্যবিয়ে হতে দিবেন না। তাঁর সংসারের উন্নতি দেখে পরিবার ও এলাকাবাসী খুবই আনন্দিত। তাঁর এ পরিবর্তন দেখে গ্রামের অন্যান্য নারীরা ঘরে বসে না থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অন্তর্ভুক্ত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। এলাকায় মোসলেমা অন্যান্য নারীর কাছে অনুকরণীয় উদাহরণ হয়ে উঠেছেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনয়ন ও যাচাই-বাছাই এবং মাঠ পর্যায়ে তাঁর সুনামের জন্য ২০২০ সালে তাঁকে জয়িতা নারী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সম্মাননা দেওয়া হয়।

শত প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে ইয়ারন এখন জয়িতা

গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়ন। যমুনা নদীর তীরে ছোট্ট গ্রাম গলনা আদর্শপাড়া। ফুলছড়ি উপজেলা বন্যাপ্রবণ। তাই প্রতিবছরই গলনাসহ পুরো এলাকা প্লাবিত হয়। ঘরবাড়িসহ আবাদি জমি পানির নিচে তলিয়ে যায়। মানুষের কষ্টের শেষ থাকে না। বন্যা শেষ হলেও অভাব থেকে যায়। কর্মসংস্থান হারিয়ে যায়। দরিদ্র মানুষের আর্থিক অনটন দেখা দেয়। আবার বন্যার পরপরই প্রবল আকার ধারণ করে নদীভাঙন। নদীভাঙনের ফলে ভিটেবাড়ি ও জমিজমা হারিয়ে মানুষ হয়ে যায় অসহায় নিঃস্ব। নদীভাঙন কবলিত মানুষের জীবনে নেমে আসে এক চরম দুর্দশা। এমনই একটি গ্রামের বাসিন্দা মোঃ ইমান আলীর মেয়ে মোছাঃ ইয়ারন বেগম। জন্ম ১৯৮৬ সালে। এক ভাই এবং এক বোন। যমুনা নদীর করাল গ্রাসে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় তাদের ভিটেবাড়ি ও জমিজমা। ভিটেবাড়ি হারিয়ে তাদের আশ্রয় হয় সরকারি আদর্শ গ্রামে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অভাব-অনটন পেরিয়ে এখানেই বড় হয়েছে ইয়ারন বেগম।

১৯৯৮ সালে ৮ম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় মাত্র ১২ বছর বয়সে তাঁরই চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিয়ে হয় ইয়ারন বেগমের। ছোট থেকেই ইয়ারন মিশুক প্রকৃতির ছিলেন এবং স্কুলেও বিভিন্ন বিষয়ে জড়িত থাকার কারণে বিয়ের পরও তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজের সাথে জড়িত হন। এলাকার মানুষের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করতেন ইয়ারন। কিন্তু ইয়ারনের স্বামী নিরক্ষর হওয়ার কারণে তিনি এসব সামাজিক কার্যক্রম পছন্দ করতেন না; ইয়ারন কারও সাথে সম্পর্ক করছেন ভেবে সন্দেহ করতেন। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয় এবং প্রায়ই তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগে থাকত। এমনকি ইয়ারনকে নির্যাতনও করা হতো। ভাইয়ের ছেলে হওয়ায় ইয়ারনের বাবা এসব বিষয়ে তেমন কিছু বলতেন না; ভাবতেন সব ঠিক হয়ে যাবে। এভাবে নির্যাতনের মধ্যেই চলে তাঁর সংসারজীবন। কিন্তু ইয়ারন তাঁর কাজে অবিচল ছিলেন। এরই মধ্যে তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ের জন্ম হয়। কিন্তু স্বামীর অত্যাচার যেন কোনোভাবেই থামছিল না। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একসময় ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি বাবার বাড়িতে চলে আসেন। বাবার বাড়িতে থেকে ইয়ারন নিজের কাজের পাশাপাশি সামাজিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এরই অংশ হিসেবে ২০০২ সালে ইয়ারন একটি বেসরকারি সংস্থার একজন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ শুরু করেন। বিনিময়ে সামান্য সম্মানী পেতেন; যা তাঁর সংসারের কাজে কিছুটা সহায়তা করতো।

২০১০ সালে এসকেএস ফাউন্ডেশনের Resilience through Economic Empowerment, Climate Adaptation, Leadership and Learning (REECALL) প্রকল্পের আওতায় তিনি একজন সিবিও সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। সিবিও সদস্য হিসেবে তিনি নেতৃত্ব ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ পান। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও নেতৃত্বদানের সক্ষমতার জন্য ২০১৬ সালে ইয়ারন বেগম সিবিও-এর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং ২০১৮ সালে সিবিও-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি গজারিয়া ইউনিয়নের সিবিও এ্যালায়েন্স-এর সভাপতি হিসেবে কাজ করছেন। ইতোমধ্যে ২০১৯ সালে ইয়ারনের স্বামী তাঁকে তালাক দেন আবার কিছুদিনের মধ্যে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাঁকে বিয়ে করেন। স্বামীও অনেক সময় তাঁর কাজে সহায়তা করতেন।

এভাবেই একজন সফল সিবিও নেত্রী হিসেবে ইয়ারন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে এলাকার মানুষের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। কৃষি দপ্তরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ইয়ারন ইতোমধ্যে তাঁর এলাকায় ৭ জন কৃষককে ৭টি কৃষি প্রদর্শনী প্লটসহ সার, বীজ ও ঔষধের ব্যবস্থা করেছেন। সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে এলাকার ৬ জন নারীকে বিধবা ভাতা, ৯ জন প্রতিবন্ধীকে প্রতিবন্ধী ভাতা এবং ১৩ জন বয়স্ক মানুষের বয়স্ক ভাতার ব্যবস্থা করেছেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ১৮ জন কিশোরীকে সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ শেষে সেলাই মেশিন পাইয়ে দিতে সহায়তা করেছেন। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ২১ জনকে মাতৃত্বকালীন ভাতা, ৮ জনকে ভিজিডি এবং ২৪ জনকে ভিজিএফ এর ব্যবস্থাও করেছেন। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে তাঁর এলাকায় ২৭ সেট ল্যাট্রিন এবং ৭টি গভীর নলকূপ স্থাপন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বে ইউনিয়নে তিনটি বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়েছে। তাঁর এই অসামান্য নেতৃত্ব গুণ এবং সমাজিক উন্নয়নে অবদানের জন্য সমাজসেবায় স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৯ সালে ইয়ারন উপজেলা পর্যায়ে জয়িতা সম্মাননা অর্জন করেন।

সমাজ উন্নয়নে জয়িতা সম্মানে ভূষিত ঝর্ণা বেগম

গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার কামারেরপাড়া ইউনিয়নের পাচেরপুর গ্রাম। ১৯৮৫ সালে মোছাঃ ঝর্ণা বেগমের জন্মের ৩ মাস পরই মৃত্যুবরণ করেন তাঁর মা। দাদির আদর, স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসায় বেড়ে উঠতে থাকেন ঝর্ণা। বাবা মোঃ হাবিজার ছিলেন একজন ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ী। মা মারা যাওয়ার কিছুদিন যেতে না যেতেই দ্বিতীয় বিয়ে করেন ঝর্ণার বাবা। দাদির ভালোবাসা পেলেও সৎমায়ের অনাদর, অবহেলা এবং অত্যাচারের মধ্যেই বেড়ে ওঠেন ঝর্ণা। বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ঝর্ণা। পড়াশোনার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল তাঁর; কিন্তু পারেননি সৎমায়ের বিমাতাসুলভ আচরণ এবং বাবার অনাগ্রহের কারণে। সৎমায়ের কূটচাল এবং বাবার চাপে ১৯৯৯ সালে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী ঝর্ণা বিয়ে করতে বাধ্য হন তাঁরই এলাকার শফিকুল ইসলামকে। পারিবারিক কলহের কারণে ২০০১ সালে এক কন্যাসন্তান রেখে স্বামী অন্যত্র চলে যান। অতঃপর নিরুপায় হয়ে মেয়ে সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে ফিরে আসেন ঝর্ণা।

২০০৩ সাল। বাবা মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে সাঘাটা ইউনিয়নের উত্তর গোবিন্দি গ্রামে দাদার বয়সি ও বিপত্নীক আনোয়ার হোসেনের সাথে আবার বিয়ে দেন ঝর্ণাকে। নতুন সংসার ভালোই চলছিল। কিন্তু ২০০৪ সালে বন্যা এবং নদীভাঙনে ফসলি জমি ও ভিটে বাড়ি হারিয়ে গেলে ঝর্ণা আবার নিরুপায় হয়ে পড়েন। গ্রামে কিছুদিন থাকার পর ২০০৫ সালে জীবিকার সন্ধানে ঝর্ণা স্বামী-সন্তান নিয়ে ঢাকায় চলে যান। সেখানে অন্যের বাসায় কাজ করে ঝর্ণা সংসার চালাতেন। এ সময় ঝর্ণার একটি ছেলেসন্তান জন্ম নেয়। ঢাকায়ও সংসার সচ্ছল করতে না পেরে ঝর্ণা স্বামী-সন্তান নিয়ে ২০০৯ সালে সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নের ভরতখালী গ্রামে ফিরে আসেন।

গ্রামে ফিরে এসেও চলে ঝর্ণার মানবেতর জীবন যাপন। এলাকার একজন সমাজকর্মীর সহায়তায় ঝর্ণা এসকেএস ফাউন্ডেশন বাস্তবায়িত প্রকল্পে মাটি কাটার কাজ করেন এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ হিসেবে বসতবাড়িতে শাকসবজি চাষের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রাপ্ত ৬,০০০ টাকা দিয়ে বসতবাড়ির পাশে শাকসবজির চাষ শুরু করেন। পাশাপাশি ঝর্ণা কিছু জমানো টাকা দিয়ে জিলাপি বানিয়ে দিতেন এবং তাঁর স্বামী গ্রামে গ্রামে ফেরি করে বিক্রি করতে লাগলেন। এভাবে চলতে থাকে ঝর্ণার সংসার।

২০১৯ সালে ঝর্ণার এলাকায় নারী ও মেয়েশিশুদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ শুরু করে এসকেএস ফাউন্ডেশনের Action for Socio-economic Security and Rights for Excluded and Marginalized Women and Girls (ASSR for EMWG)। প্রকল্পের আওতায় ঝর্ণা সূর্যমুখী নারী দলের সদস্য হন এবং সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রকল্প কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে ঝর্ণা নারী অধিকার, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রতিরোধ এবং সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রাপ্তি সম্পর্কে জানার পাশাপাশি নিজের আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে আরো জানতে পারেন। তিনি বসতভিটায় আধুনিক পদ্ধতিতে শাকসবজি চাষের পাশাপাশি বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন শুরু করেন। চলমান জিলাপি বিক্রি ও শাকসবজি চাষের পাশাপাশি এবার তিনি হাঁস-মুরগি পালন করে বেশ আয় করেন।

প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ঝর্ণা নিজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজের উন্নয়নে নিজেকে যুক্ত করেছেন। উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ততার সূত্র ধরে এবং তাঁর এই নেতৃত্বের জন্য বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথেও সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ২০১৯ সালের বন্যায় তাঁর এলাকার দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ান ঝর্ণা। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ফিটকিরি, নলকূপ ও পায়খানার ব্যবস্থা করেন। এ সময় স্থানীয় পর্যায়ে নারী ও শিশুর নিরাপত্তা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হন তিনি এবং বন্যাকালীন নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি দরিদ্র ও দুঃস্থ নারীদের সরকারি সেবাসমূহ নিশ্চিত করণে ঝর্ণা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি এলাকার গরিব ও দুঃস্থ নারীদের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ৫টি ভিজিডি, ৩৭টি ভিজিএফ, ২টি বিধবাভাতা, ৫টি নতুন নলকূপ স্থাপন, ২৭টি নলকূপ মেরামত, ১৭টি পায়খানা মেরামত এবং ১২টি নতুন পায়খানা স্থাপন নিশ্চিতকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়া ১৭ জন গর্ভবতী মাকে স্বাস্থ্যবিধি সরঞ্জাম, ৫ জন স্বামী পরিত্যক্তা নারীকে সালিশের মাধ্যমে স্বামীর ঘরে ফিরতে সহায়তাসহ ৮টি পরিবারে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করেছেন। তিনি ভরতখালী গ্রামে ৬ষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীসহ ৪ জনের বাল্যবিবাহ রোধ করেছেন। স্থানীয় উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে ঝর্ণা নিজে গবাদি পশুর রোগ-বালাই দমন ও টিকা প্রদানের ওপর ৩ দিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাকায় পশু ভ্যাকসিনেটর হিসেবে মাঝে মাঝে কাজ করেন। সমাজসেবায় তাঁর এই অবদানের জন্য ২০২১ সালে ঝর্ণাকে উপজেলা পর্যায়ে জয়িতা সম্মানে ভূষিত করা হয়।

নির্যাতন প্রতিরোধে বিজয়ী অজিফা বেগম

অজিফা বেগমের ১৫ বছর বয়সে বাল্যবিয়ে হয় লালমনিরহাট উপজেলার কুলাঘাট ইউনিয়নের শিবেরকুটি গ্রামের মাহবুব হোসেন (৪২) এর সাথে। সামাজিক সচেতনতার অভাবে প্রতিরোধের কোন উপায় ছিলো না। অপরিণত বয়সে বিয়ে হওয়ার পর থেকেই শুরু হয় নানা ধরণের নির্যাতন। মাহবুব হোসেন পেশায় রাজমিস্ত্রি। মাহবুব হোসেন পেশার সুবাদে বিভিন্ন গ্রামে অবস্থান করতেন। কাজের ফাঁকে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। সম্পর্কের এক পর্যায়ে গোপনে ২য় বিবাহ করেন মাহাবুব। ঘটনার প্রতিবাদ করায় স্বামী মাহাবুব অজিফা'র উপর নানাভাবে নির্যাতন করতে থাকে। মানসিক, শারীরিক এবং অর্থনৈতিকসহ সকল ধরনের নির্যাতন করতে থাকেন। স্বামীর নির্যাতনের উপর যুক্ত হয় শ্বশুর ও শাশুড়ির বিরুপ আচরণ। স্বামীকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও তিনি বোঝেন না বরং দিন দিন নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকে।

এক পর্যায়ে অজিফা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। মাসিক ভরণপোষণ দিতেও গড়িমসি শুরু করেন মাহাবুব। একটি সন্তান নিয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য অজিফা কোনরকমে দিন পার করতে থাকেন। অনেক কষ্ট সহ্য করার পর একদিন বাবাকে ঘটনা খুলে বলেন অজিফা। অজিফার বাবা তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে কথা বলতে চাইলে তারা বিভিন্ন ধরণের মিথ্যে অপবাদ দিয়ে তাঁর বাবাকে অপমান করেন। ঘটনাচক্রে জীবিকার তাগিদে বিআরডিবি লালমনিরহাট প্রশিক্ষণ সেন্টারে সেলাই কাজের উপর ৩ মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন অজিফা। প্রশিক্ষণ শেষে সেলাই মেশিন কেনার জন্য এককালীন সরকারি সহায়তা হিসেবে ৯,৫০০ টাকা অনুদান পান তিনি। প্রাপ্ত অনুদানের টাকা দিয়ে তিনি একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। শুরু করেন নিজের পরিশ্রমে আয়-রোজগার। কিন্তু এর পরেও তাঁর স্বামীর নির্যাতনের মাত্রা থেমে থাকেনি। অজিফা জানান, "একদিন সেলাই মেশিনে কাজ করা অবস্থায় আমার স্বামী সেলাই মেশিনে লাথি মেরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মেশিন ছিটকে গিয়ে আমার কপালে লাগলে আমার নাকের হাড় ভেঙ্গে যায় এবং অনর্গল রক্ত ঝরতে থাকে। স্বামীর পরিবারের কেউ আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়নি। নিরুপায় হয়ে আমি নিজেই হাসপাতালে গিয়ে ১,৫০০ টাকা খরচ করে চিকিৎসা করে ভালো হই। পরে গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে আমার স্বামী কিছুদিন সমঝোতায় শান্ত থাকে। তারপর আবার শুরু হয় নির্মম নির্যাতন। নিরুপায় হয়ে কিছুদিন পর কাজের সন্ধানে ঢাকায় চলে যাই। সেখানে ভালো আয়-রোজগারের সুযোগ না থাকায় টিকতে পারি নাই। কয়েক মাস পর আবার গ্রামে ফিরে আসি।"

গ্রামে ফিরে এসকেএস ফাউণ্ডেশন-এর পাওয়ার প্রকল্পে আওতায় নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে অজিফা বলেন, "২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে পাওয়ার প্রকল্পের আওতায় আমি শিউলি নারী দলের সদস্য হিসেবে যুক্ত হই। বিভিন্ন ধরণের সভা এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে থাকি। এখানে এসে আমি জানতে পারি বাল্যবিবাহ কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়। যৌতুক বন্ধ, তালাক প্রতিরোধ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধ বিষয়ে সচেতন হই, আইন সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে পারি। এছাড়া নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ণ, মানবাধিকার, গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের মূল্যায়ন, নারী নেতৃত্ব, সবজি চাষ, জলবায়ু সহনশীল টেকসই কৃষি চর্চা, আয়মূলক কাজ ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারি এবং চর্চা করতে শুরু করি। আমি ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠি। পরবর্তীতে শিউলি নারীদলের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে বিভিন্ন সভায় নেতৃত্ব প্রদান করি। আমি বলতে চাই, আমরা পিছিয়ে পড়া নারীরা আর পিছিয়ে থাকবো না। আমরা সংগঠিত হয়েছি। আমি

ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে বিভিন্ন ধরনের সেবা আদায় করতে সমর্থ হয়েছি। যেমন- ২ জনকে ভিজিডি কার্ড, শিউলি নারীদলের ১৫ জনকে রেশন কার্ড, ১ জনকে প্রতিবন্ধী ভাতা কার্ড পেতে সহায়তা করেছি। উপজেলা অফিস থেকে ১১ প্রকার বীজ বিভিন্ন পরিমাণে সংগ্রহ করে দলের সদস্যদের মাঝে বিতরণ করেছি। উপজেলা থেকে ১০ কেজি আউশ ধানের বীজ এনে ২ জন সদস্যকে ভাগ করে দিয়েছি। ঈদের সময় ২৫ জন সদস্যকে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ভিজিএফ এর ১০ কেজি করে চাল পেতে সহায়তা করেছি। গর্ভকালীন ভাতা পেতে ৩ জনকে সহযোগিতা করেছি। প্রত্যেকে ২৮,০০০ টাকা করে ভাতা পেয়েছে। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কমিটিতে আমার দলের ৯ জন সদস্য ৯ ওয়ার্ডের (ত্রাণ) কমিটিতে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে সহযোগিতা করেছি। আমি নিজে ইউনিয়ন পরিষদের নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিভিন্নভাবে সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছি।"

অজিফা গ্রামের ২টি পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনা বন্ধ করতে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাদের ১ জন দলের অন্যজন দলের বাইরের। বর্তমানে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন। এছাড়া অজিফা প্রকল্পের বাইরে মৎস্য চাষ এবং নারী নির্যাতন বন্ধের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি দলের নারী সদস্য ও ইউনিয়ন

পরিষদকে সাথে নিয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কাজ করতে থাকেন। গঠিত দলগুলোর নারীরা এখন অনেক বেশি সচেতন, কোথাও কোন বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে ১০৯ ও ৯৯৯ এ ফোন করে সহযোগিতা নিতে কাজ করেন। যা দলের মধ্যে নির্যাতন রেজিস্টারে নথিভুক্ত করে রাখেন। পাশাপাশি দল ও ফেডারেশনের মিটিংয়ে বিভিন্ন সমস্যা এবং দলের মধ্যে যেকোন নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে কার্যকরী আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করেন।

এসব কাজের মধ্যেও অজিফা পারিবারিকভাবে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ করে এবং পাওয়ার প্রকল্পের কুলাঘাট ইউনিয়নে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করে আয়-রোজগার করে। বর্তমানে তাঁর পারিবারিক আয় বেড়েছে। আয় থেকে ৫৫,০০০ টাকা দিয়ে অজিফা ১৫ শতাংশ জমি বন্ধক নিয়েছেন। আয় করা দেখে তাঁর স্বামী আর কোন রকম নির্যাতন করেন না। স্বামী সাংসারিক সকল কাজে সহায়তা করেন। ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা করেন। অজিফার মতামতের প্রতি গুরুত্ব দেন। তাঁর সাথে ভালো ব্যবহার করেন। তাঁরা দুজন মিলে সংসারের উন্নতিতে কাজ করে যাচ্ছেন। জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনে দুজনের ভূমিকাই এখন মূখ্য। অজিফার ধৈর্য্য আর সাহস তাঁর স্বামীর অবহেলা থেকে তাঁকে মুক্ত করেছে। স্বামী মাহাবুব কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করেন। দুজনের পরিবার এখন একটি সুখী পরিবার। এ সবের জন্য তাঁর স্বামী অজিফাকেই স্বীকৃতি দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানান। গ্রামীণ সমাজে এমন সাহসী ভূমিকার জন্য লালমনিরহাট সদর উপজেলা প্রশাসন সাহসী নারী এবং নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়কে স্বীকৃতিস্বরূপ অজিফাকে ২০২০ সালের ৯ ডিসেম্বর জয়িতা পুরস্কার প্রদান করেন।

সমাজ উন্নয়নে রোজিনার ভূমিকা অসামান্য

"আমি মোছাঃ রোজিনা বেগম। বয়স ৩০ বছর। স্বামী- মোঃ ফারুক মিয়া, মাতা- মোছাঃ অমেদা বেগম। গ্রাম- পশ্চিম লালচামার, ইউনিয়ন- কাপাসিয়া, উপজেলা- সুন্দরগঞ্জ, জেলা- গাইবান্ধা। বাবা-মা আমায় অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের কিছুদিন পরেই আমার স্বামী মারা যায়। স্বামী মারা যাবার ২ বছর পর আবার দুই পরিবারের সম্মতিতে আমার দেবরের সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের কয়েক বছর পর ভিটে বাড়ি যেটুকু ছিল, তা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ২ সন্তান নিয়ে বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠি। নদীভাঙনের যে কি কষ্ট তা আমি জানি।" কথাগুলো প্রত্যন্ত নদী-তীরবর্তী অতি সাধারণ দরিদ্র পরিবারের এক নারী রোজিনার। তাঁর কষ্টের কথা, আর সংগ্রামের মধ্যদিয়ে কষ্ট জয় এবং সমাজ উন্নয়নে তাঁর অসামান্য অবদানের কাহিনী অবাক হওয়ার মতো।

এতসব কষ্টকে জয় করে এগিয়ে গেছে রোজিনা। দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন আর দশজন সমাজ-সচেতন মানুষের মতোই। দায়িত্ব পালন করেছেন সামাজিক সচেতনতার জন্য। দাঁড়িয়েছেন অসহায় বিপদাপন্ন নারীর পাশে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘ সময়। জানা গেল তাঁর জীবন সংগ্রাম আর অঙ্গীকারের কথা।

রোজিনা জানালেন, "নদীগর্ভে নিজের ভিটেমাটি হারিয়ে যাওয়ার সময় আমি বুঝতে পারি যে, নদীপারের মানুষগুলো কতো অসহায়, কতোটা ঝুঁকির মধ্যে দিন যাপন করে। ভিটেবাড়ি নদীতে ভেঙে গেলে নিঃস্ব হয়ে সহায়-সম্বলহীন দিন পার করা কত কষ্টের। আমার চোখের সামনে যখন তিস্তা নদীর ভাঙনে আমার ঘরবাড়ি ভেসে যায়, তখন খুবই কাছে থেকে নদীপারের মানুষের কষ্ট আমি উপলব্ধি করি। আর তখনই আমি সিদ্ধান্ত নেই যে, দুর্যোগের পূর্বাভাস জানা মাত্রই আমি আমার এলাকার লোকজনকে জানাবো। রেডিও, টেলিভিশনে সংবাদ শোনামাত্র এলাকায় তা আমি হ্যান্ড মাইকের মাধ্যমে প্রচার করবো। সেই থেকে এলাকায় বিভিন্ন এনজিওকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করে এলাকার মানুষকে সচেতন এবং সংগ্রামী হতে উদ্বুদ্ধ করি। বিভিন্ন দিবসে সরকারি বেসরকারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকি এবং ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সালিশী কাজেও উপস্থিত হই। এছাড়াও আমার গ্রামে কোন নারী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। এসব কাজ করতে গিয়ে এলাকার লোকজন বিশেষকরে নারীরা অনেক বাঁকা বাঁকা কথাও বলতো এক সময়। আমি তাদের কথায় কর্ণপাত না করে আমার মতো করে কাজ করতাম। দিনের পর দিন এভাবে কাজ করতে করতে এলাকার যে কোন নারীর সমস্যা হলে লোকজন আমাকে ভরসা করতে শুরু করে। এসব কাজ করতে গিয়ে আমার স্বামী আমাকে অনেক বাধা দিত। কিন্তু সব উপেক্ষা করে আমি এ কাজগুলো করি। এলাকার লোকজনের

ভালোবাসায় আমি এসব কাজ করতে উৎসাহ পাই। এভাবে সমাজে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সাথে কখনো সরাসরি আবার কখনো পরোক্ষভাবে জড়িত হয়েছি। দায়িত্ব পালন করেছি। প্রতিদানে সমাজ আমাকে মূল্যায়ন করেছে। আমাকে জয়িতা নারী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।"

কাজের বর্ণনা বেশি না দিলেও রোজিনার অদম্য পথ চলা, নদীগর্ভে ঘরবাড়ি হারিয়ে সহায়-সম্বলহীন জীবনের তাগিদে ঝুঁকির মধ্যেও লড়াকু মানসিকতা নিয়ে সমাজের অন্যান্য মানুষের পাশে দাঁড়াতে কতজনেরই বা ইচ্ছে হয়। এটা অবশ্যই সঠিক যে তৃণমূল পর্যায়ে বিপদাপন্ন এলাকায় এমন অদম্য নারী খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। তারপরও রোজিনার দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রামের অন্যান্য নারীদেরকে সাহসী ও সংগ্রামী হতে উদ্বুদ্ধ এবং উৎসাহিত করেছে। তাঁর সাহসী ভূমিকার স্বীকৃতিও পেয়েছেন রোজিনা। সুন্দরগঞ্জ উপজেলার মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর রোজিনা বেগমকে জয়িতা নারীর সম্মাননায় ভূষিত করে ২০১৯ সালে।

নতুন উদ্যমে শুরু মঞ্জুয়ারার জীবন

গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের কাতলামারী গ্রাম। গ্রামে নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী নারী মোছাঃ মঞ্জুয়ারা বেগম। মঞ্জুয়ারা ২ ভাই ও ৫ বোনের মধ্যে বড়। স্বপ্ন ছিল পড়ালেখা করে মানুষের মতো মানুষ হয়ে চাকুরি করবেন এবং বাবার সংসারের হাল ধরবেন। কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে যায়। পরিবারের অসচ্ছলতার কারণে বাবা ১৯৯৯ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে মধ্য কাতলামারী গ্রামে মঞ্জুয়ারার বিয়ে দিয়ে দেন। ১৩ বছরের মেয়ের সংসার, শ্বশুরবাড়ি কোনোকিছুই বুঝবার কথা নয়। শ্বশুরবাড়ির কাজকর্ম, স্বামীর সেবা-যত্ন সবকিছুই তাঁর কাছে ছিল দুর্বোধ্য। ফলে নিত্যদিন স্বামীর শারীরিক নির্যাতন ও শাশুড়ির মানসিক অত্যাচার চলতে থাকে মঞ্জুয়ারার ওপর।

বিয়ের দুই মাস পর মঞ্জুয়ারার স্বামী যৌতুকের দাবি করে এবং ২০ হাজার টাকার জন্য চাপ দিতে থাকে। কিন্তু অসহায় বাবার কাছে টাকার কথা বলার সাহস না পেয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে থাকেন মঞ্জুয়ারা। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর অন্যের বাড়িতে কাজ করে আয়-রোজগার শুরু করেন। দেড় বছর পর একটি ছেলেসন্তানের মা হন মঞ্জুয়ারা। বিয়ের তিন বছরের মাথায় তার স্বামী মারা যান। স্বামী মারা যাবার পর আবারও তাঁর জীবনে নেমে আসে অসহনীয় দুর্ভোগ। কিন্তু দারিদ্র্যের কাছে হার মানেননি মঞ্জুয়ারা। জীবনসংগ্রামের পথে আরও বেশি উদ্যমী হয়ে এগিয়ে চলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন; আরও বেশি জেদী হয়ে ব্র্যাক অফিস থেকে ধাত্রী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কিন্তু হতাশাজনকভাবে প্রশিক্ষণের পরও তাঁর ধাত্রী কাজে তেমন আয়-রোজগার হয় না। কারণ তখনও তাঁর পরিচিতি হয়নি তেমন। এলাকার মানুষ তাকে এই কাজে ভালোভাবে চেনে না। হতাশার বৃত্তেই ঘুরপাক খেতে থাকেন মঞ্জুয়ারা।

এ অবস্থার মধ্যে ২০১৬ সালে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এসকেএস ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত Strengthening Household Ability to Respond to Development Opportunists (SHOUHARDO-III) কর্মসূচির আওতায় অতিদরিদ্র তালিকার অন্তর্ভুক্ত হন মঞ্জুয়ারা। তালিকাভুক্ত হয়ে তাঁর কর্মদক্ষতায় মঞ্জুয়ারা সবার কাছে পরিচিত ও প্রশংসিত হতে থাকেন। একতা দলের নিয়মিত সেশনে এসে জানতে পারেন, নারী হিসেবে সমাজের সকল স্তরে ভূমিকা রেখে কিভাবে একজন সফল নারী নেত্রী হয়ে ওঠা সম্ভব এবং কিভাবে ন্যায্য ক্ষমতাবান হওয়া যায়। আয়োজিত সেশনের মাধ্যমে জানতে পারেন, নারীর ক্ষমতায়ণ কাকে বলে। মঞ্জুয়ারার পরিচিতি বৃদ্ধির সাথে সাথে ধাত্রীর কাজেও বেশ ডাক আসতে থাকে। আয় বাড়তে থাকে মঞ্জুয়ারার। একতা দলের সদস্য হিসেবে সৌহার্দ্য-৩ কর্মসূচি থেকে ৪,৫০০ টাকা এককালীন অনুদান পান মঞ্জুয়ারা। সেই টাকায় বাড়িতেই একটা দোকান দিয়ে নারীদের বিভিন্ন প্রসাধনসামগ্রী বিক্রি করতে থাকেন। দোকান থেকে দিনে আয় দাঁড়ায় ২৫০-৩০০ টাকা। আয় থেকে নিয়মিত সঞ্চয়ের মাধ্যমে বর্তমানে তার একটি টিনের ঘর হয়েছে। হাঁস-মুরগি

পালন করছেন বাড়িতে। বর্তমানে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করছে। এলাকার বিভিন্ন সহিংসতামূলক কাজে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় নেতৃত্ব দেওয়া, সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে দলবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ, মানুষের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে কথা বলা, ইউনিয়ন পরিষদের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটিতে সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখা, এলাকার বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, নারী নির্যাতনের প্রতিরোধে কাজ করাসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন মঞ্জুয়ারা।

গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের নারী মঞ্জুয়ারার সংগ্রামী জীবনের স্বীকৃতি হিসেবে এবং নারীর কাজে উৎসাহ প্রদানের উদ্যোগে সরকারিভাবে ঘোষিত নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন তালিকাভূক্ত হয়ে তাঁর কর্মদক্ষতায় মঞ্জুয়ারা সবার কাছে পরিচিত ও প্রশংসিত হতে থাকেন। একতা দলের নিয়মিত সেশনে এসে জানতে পারেন, নারী উদ্যোমে জীবন শুরু ক্যাটাগরিতে ২০১৯ সালে জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ জয়িতা হিসেবে নির্বাচিত হয়ে জয়িতা সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণ করেন মঞ্জুয়ারা বেগম। এই সম্মাননা পুরস্কারে ভূষিত হয়ে মঞ্জুয়ারা এলাকার মানুষের কাছে একজন আদর্শ নারী এবং অধিক গ্রহণযোগ্য মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এলাকার সমস্যায় স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান এবং উপজেলা প্রশাসনের নিকট তিনি একজন বার্তাবাহক হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। নিজের সফলতা সম্পর্কে মঞ্জুয়ারা বলেন, "এলাকার লোকেরা এখন আমাকে যেকোনো বিপদে ডাকে এবং মূল্যায়ন করে। আমি যেকোনো সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে পারি, নিজের পছন্দমতো জিনিস ক্রয় করি। আমি এখন স্বাবলম্বী, দুই সন্তানকে নিয়ে ভালো আছি। অতীত জীবনের বিভিন্ন নির্যাতন, যন্ত্রণা ও অসহায়ত্বকে মুছে ফেলেছি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিজেকে সংযুক্ত করেছি। আমি মনে করি– "নির্যাতনের বিভীষিকা, দারিদ্র্য কোনো বাধা নয়, যদি আত্মবিশ্বাস ও মনোবল থাকে, তবে যে-কোনো কঠিন পরিস্থিতি ও পরিবেশকে জয় করা সম্ভব।"

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতেই লিপি জয়িতা

গ্রামীণ নারীদের বেশিরভাগই ব্যস্ত অনুৎপাদনশীল কাজ নিয়ে। অর্থনৈতিক মানদণ্ডে যে কাজের স্বীকৃতি পাওয়া পুরুষ শাসিত এই সমাজে এখনও বড় চ্যালেঞ্জ। খুব সহজেই যে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে সেটিও বলা বড়ই কঠিন। কারণ যুগ যুগ ধরে নারী পুরুষ উভয়ই এখনও পুরুষ শাসিত সমাজের নানাবিধি কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করছে। নেই কোন প্রতিবাদ, নেই কোন প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা। তবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটছেও অনেক খানি; যা চলমান প্রতিনিয়ত। নারীরা এখন গ্রামে, শহরে সকল স্তরে সরাসরি আর্থিক কাজে নেমে পড়ে নিজেদের ভাগ্য বদলাতে ভূমিকা রাখছেন। এমনি একজন নারী সাঘাটা উপজেলার হাসিলকান্দি গ্রামের লিপি বেগম।

গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার ৩নং সাঘাটা ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম হাসিলকান্দি। গ্রামে মোট খানার সংখ্যা প্রায় ৫৩০। সর্বগ্রাসী যমুনা নদীর করাল গ্রাসে বিলীন হয়ে যায় কিছু পরিবার। চলতে থাকে তাদের দুর্বিসহ জীবন-জীবিকায়ন। তারপরও বুকভরা আশা নিয়ে কিছু মানুষ অব্যাহত রাখেন তাঁদের জীবন-যাত্রা। বন্যা এবং নদীভাঙন হাসিলকান্দি গ্রামের মানুষের নিয়মিত সঙ্গী। প্রতি বছর বন্যায় তলিয়ে যায় অনেক ঘর-বাড়ি ও ফসলের ক্ষেত। ক্ষণিকের আশ্রয় হিসেবে বেছে নেয় নদী পাড়ের বাঁধ। অন্ধকারের বেড়াজালে হতাশায় দিন কাটতে থাকে এই দরিদ্র পরিবারগুলোর। এমন বিপদাপন্ন সময়ে তাদের পাশে মাঝে-মধ্যে দাঁড়ায় কিছু বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। অনেক সময় সরকারের অস্থায়ী প্রকল্পগুলো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেও স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের জন্য নেই কোন পদক্ষেপ।

২০১৬ সাল। এসকেএস ফাউন্ডেশন কেয়ার বাংলাদেশ-এর সাথে অংশীদারিত্বমূলক সৌহার্দ্য-৩ কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু করে ৩নং সাঘাটা ইউনিয়নে। সৌহার্দ্য-৩ কর্মসূচির অধীনে জরিপ কার্যক্রমে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র সদস্য হিসেবে তালিকাভূক্ত হয় ২৭০টি পরিবার। সৌহার্দ্য-৩ কর্মসূচির অংশ হিসেবে পেশাভিত্তিক সংগঠন-এর আওতায় অনেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়। এর মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসা অন্যতম। এর মাধ্যমে হাসিলকান্দি গ্রামের নারীদলের সদস্য মোছাঃ লিপি বেগমের স্বামী মোঃ শহিদুল ইসলাম, খানা নং-০১২১ ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে প্রকল্প থেকে নগদ অর্থ

হিসেবে তাঁকে ৯,৬০০ টাকা প্রদান করে এবং এসকেএস ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি থেকে ১৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ক্ষুদ্র ব্যবসা হিসেবে টেইলারিং-এর কাজ শুরু করেন এই দম্পত্তি। বর্তমানে লিপি বেগমের অধীনে টেইলরিং-এর কাজ করে একই গ্রামের অন্য ৩ জন নারী শ্রমিক। তাদের তৈরিকৃত পোশাকের মধ্যে রয়েছে ছোট শিশুদের পোশাক, ফ্রক, প্যান্ট, ম্যাক্সি, স্যালোয়ার-কামিজ, ব্লাউজ, সোফার কুশন, বালিশের কভার এবং গ্রাহকের চাহিদানুযায়ী অন্যান্য পোশাক সামগ্রী। শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বাবদ প্রতিমাসে ৩ জনকে লিপি বেগম ৯,০০০ টাকা প্রদান করেন এবং সব খরচ শেষে প্রতিমাসে তিনি ৫-৬ হাজার টাকা আয় করেন। অন্যদিকে লিপি বেগমের স্বামী মোঃ শহিদুল ইসলাম গ্রামে গ্রামে ফেরি করে তৈরিকৃত কাপড় বিক্রি করেন। তাঁর ক্ষুদ্র উদ্যোগের কারণে এলাকার মানুষ তাঁকে অনেক সম্মান করে এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করে।

২০১৯ সালে সাঘাটা উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে লিপি বেগম অর্থনৈতিক ক্যাটাগরিতে সাঘাটা উপজেলার শ্রেষ্ঠ জয়িতা হিসেবে নির্বাচিত হন। এই সম্মাননা লাভ করায় তিনি আরও বেশি উদ্বুদ্ধ হয়ে বড় পরিসরে নিজেকে নিয়ে যেতে আগ্রহী হন। এই জন্য তিনি সাঘাটা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে একটি টিনের ঘর অনুদান পেয়েছেন এবং সেই ঘরে বেশ বড় পরিসরে কারখানা স্থাপন করেছেন। এখন তাঁর কারখানায় কর্মরত মানুষ সহজেই চলে ফিরে স্বাচ্ছন্দে সেলাইয়ের কাজ করতে পারেন। কাজের পরিসর বেড়ে যাওয়ায় পোশাক উৎপাদনও বেশি হয়। বর্তমানে দোকানে নিয়মিত মজুদও থাকে প্রায় ৮০-৯০ হাজার টাকার কাপড়। লিপি বেগম এখন একজন ছোটখাটো মহাজন। পরিবারসহ এখন সুখের জীবিকায়ন তাঁর। তিনি বিশ্বাস করেন, পরিশ্রম এবং আত্মবিশ্বাস থাকলে জীবনের গতি বদলানো সম্ভব।

নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে স্বাবলম্বী রুপালী জয়িতা

১৯৯৪ সালে গাইবান্ধা জেলা সদরের বোয়ালী ইউনিয়নের পূর্ব রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মোছাঃ রুপালী বেগম। বাবা মোঃ মজিবুর রহমান এবং মোছাঃ মজিরন বেগম। বাবা দিনমজুর। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে রুপালী চতুর্থ এবং পড়াশোনায় ভাল ছিলেন। রুপালীর পড়াশোনা করার খুব ইচ্ছা থাকলেও অভাব ও সামাজিক পরিস্থিতি তাঁকে বেশি দূর এগোতে দেয়নি। অকালেই স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় রুপালীর। বাবার আর্থিক অসচ্ছলতা ও সামাজিক প্রতিকূল পরিস্থিতি ৭ম শ্রেণির ছাত্রী রুপালীকে মাত্র ১৪ বছর বয়সেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বাধ্য করে। ২০০৮ সালে ২৫,০০০ টাকা যৌতুকে বিয়ে হয় একই গ্রামের মোঃ ইছাহাক আলীর তৃতীয় পুত্র মোঃ রেজাউল করিমের সাথে ৬৫,০০০ টাকা দেনমোহরে। রুপালীর বাবা দিনমজুর হওয়ায় জমানো কোনো টাকাও ছিল না। তাই বাড়িভিটার কিছু অংশ বিক্রি করে রুপালীর বিয়ের যৌতুকের টাকা যোগাড় করেছিলেন তাঁর বাবা। বিয়ের আগে দুই পরিবারের মধ্যে মৌখিক কথা হয়েছিল বিয়ের পর রুপালীর স্বামী ও তার পরিবার রুপালীর লেখাপড়া অব্যাহত রাখবেন। 'বিয়ের পর মেয়েদের পড়াশোনা করে কোনো লাভ নেই' এই কথা বলে বিয়ের দু'মাসের মধ্যেই রুপালীর লেখাপড়া বন্ধ করে দেন তাঁর রিক্সাচালক স্বামী।

এইদিকে চতুর রেজাউলের চরিত্র আস্তে আস্তে পাল্টাতে থাকে। এক সময় জানায়, রিক্সা চালাতে তার ভাল লাগছে না, ব্যবসা করবে। এজন্য রুপালীর স্বামী শ্বশুর বাড়ি থেকে ২০,০০০ টাকা নিয়ে আসার জন্য তাঁকে চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন এবং ক্রমান্বয়ে চাপ বাড়তে থাকে। দিন মজুর বাবার আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে বাবাকে বলার সাহস পাচ্ছিলেন না তিনি। এজন্য তাঁকে অনেক নির্যাতনও সহ্য করতে হয়েছে। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে এক পর্যায়ে বিষয়টি তাঁর বাবাকে জানায় রুপালী। কিন্ত রুপালীর গরিব বাবার পক্ষে ২০,০০০ টাকা দেয়া সম্ভব ছিল না। নির্যাতনের মাত্রা যেন আরও বাড়তে থাকে। না খাইয়ে রাখা হয় রুপালীকে। পাশাপাশি এও জানিয়ে দেয়া হয়, টাকা আনতে পারলে সংসার হবে, না হলে সংসার হবে না। স্বামীর এমন অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এক পর্যায়ে রুপালী তাঁর বাবার বাড়িতে চলে যান। আর নির্যাতন করবেন না এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়িতে নিয়েও আসেন রুপালীকে। এভাবে বেশ কয়েকবার নির্যাতনের কারণে বাবার বাড়িতে গিয়েছিলেন রুপালী। আবার স্বামীর প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসার কারণে সহজ সরল রুপালী স্বামীর মিষ্টি কথায় ভুলে চলেও এসেছিলেন।

কোন কিছুতেই যখন শ্বশুরের কাছে টাকা পেলেন না, তখন অন্য ফন্দি আটলেন রুপালীর স্বামী রেজাউল। এবার ঢাকায় গিয়ে গার্মেন্টেসে চাকুরি করবেন বলে প্রস্তাব দিলেন এবং সাথে রুপালীকেও নিয়ে যাবেন। সহজ সরল রুপালী স্বামীর ফন্দি বুঝতে না পেরে রাজি হয়ে গেলেন। রুপালী বেগম তাঁর স্বামীর সাথে ঢাকায় চলে গেলেন। ঢাকায় প্রথম দিকে রুপালীর স্বামী রিক্সা চালাতেন, পড়াশোনা না জানা রেজাউল কোন চাকুরি পাচ্ছিলেন না। এক পর্যায়ে তিনি রুপালীকে চাকুরি করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়া রুপালী কিইবা চাকুরি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। তাছাড়া তার কোন অভিজ্ঞতাও নাই। স্বামীর রোজগার কম হওয়ায় কোন উপায় না দেখে রাজি হয়ে যান এবং ২০০৯ সালে গাজীপুরের একটি পোশাক কারখানায় মাত্র ৫,০০০ টাকা বেতনে চাকুরি নেন রুপালী বেগম। তাঁর চাকুরির পর এবার রেজাউল রিক্সা চালানো বন্ধ করে দেয়। রুপালীর প্রতি মাসের বেতনের টাকা জোরপূর্বক নিয়ে নিতেন তার স্বামী। অফিসে যাতায়াত কিংবা হাত খরচের জন্য রুপালী কোনো টাকা-পয়সা চাইলে মারধর করতেন। এইদিকে রুপালীর প্রতি মাসের বেতনের টাকা দিয়ে রেজাউল নেশা করতেন, জুয়া খেলতেন এবং পরকীয়া করতেন। নানা কলহের মধ্যে এভাবে ঢাকায় কেটে যায় ৪টি বছর। ২০১৩ সালে রুপালী যখন ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা তখন চাকুরি ছেড়ে তিনি বাবার বাড়িতে ফিরে আসেন। গ্রামের বাড়িতে আসার পর ২০১৪ সালে তাঁর একটি ছেলে সন্তানের জন্ম হয়। সন্তান জন্মের কিছু দিনের মধ্যেই রুপালীর স্বামী তাঁকে আবার ঢাকায় গিয়ে চাকুরি করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। কিন্তু রুপালী তাঁর কোলের সন্তান রেখে আর চাকুরি করবেন না বলে জানিয়ে দেন। এদিকে তাঁর স্বামীও চাপ দিয়ে বলেন, চাকুরি না করলে তিনি তাঁর সাথে সংসার করবেন না। এক পর্যায়ে রেজাউল রুপালী ও তাঁর সন্তানের খবর নেয়া বন্ধ করে দেন।

সন্তানের ভরণ-পোষণ না পেয়ে নিজের এবং সন্তানের কথা বিবেচনা করে ছোট শিশুসন্তানকে তাঁর মায়ের কাছে রেখে ২০১৫ সালে রুপালী একাই ঢাকায় চলে যান এবং পোশাক কারখানায় আবারও চাকুরি নেন। কিছুদিন পর সন্তানকেও নিয়ে যান। স্ত্রী আবারো চাকুরি করছে এবং হাতে যথেষ্ট টাকা-পয়সা আছে এই চিন্তা করে ২০১৮ সালে তাঁর স্বামী আবারো যোগাযোগ শুরু করেন এবং রুপালী আবারও স্বামীকে আশ্রয় দেন। ছয় মাস এক সাথে থাকার পর সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়লে রুপালী সন্তানকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। সন্তান সুস্থ হলেও আর ঢাকায় যাবেন না বলে ঠিক করেন রুপালী। এদিকে তাঁর স্বামী আবারও চাপ দিতে থাকেন। ঢাকায় এসে চাকুরি না করলে রুপালীর সাথে সংসার করবেন না বলে জানান তাঁর স্বামী। স্বামীর এমন আচরণ কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না রুপালী এবং গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের কাছে স্বামীর বিচার চান। গ্রাম্য শালিশ-বৈঠকের মাধ্যমে স্বামী তাঁকে তালাক দেন এবং

দেনমোহর বাবদ ৬৫ হাজার টাকা রুপালী বেগমকে দেয়া হয়। সেই দেনমোহরের টাকা দিয়ে রুপালী বেগম গাভী পালন শুরু করেন তাঁর বাবার বাড়িতে।

এরই মধ্যে ২০১৯ সালে এসকেএস ফাউন্ডেশন Action for Socio-economic Security and Rights for Excluded and Marginalized Women and Girls (ASSR for EMWG) প্রকল্প রুপালী বেগমের গ্রামে কার্যক্রম শুরু করে। কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পূর্ব রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামে নারীদল গঠন করা হলে রুপালী যমুনা নারী দলের সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। দলে অর্ন্তভুক্ত হওয়ার পর রুপালী বেগম প্রকল্পের নিয়মিত সভা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন।

যেহেতু আগে থেকে রুপালী বেগম গরু পালন করে আসছিলেন, তাই তিনি আধুনিক ও লাভজনক উপায়ে গরু পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি অর্থ ব্যবস্থাপনার উপরও প্রশিক্ষণ নেন। এই প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর রুপালী বেগম তাঁর গরুটি ৮০,০০০ টাকায় বিক্রি করেন। কিছু টাকা দিয়ে একটি এড়ে বাছুর এবং কিছু হাঁস-মুরগি ক্রয় করেন। আর কিছু টাকা রেখে দেন তাঁর সংসার খরচের জন্য। অল্প সময়ে বাড়তি আয়ের জন্য রুপালী গাভী পালনের পরিবর্তে গরু মোটাতাজাকরণ এবং হাঁস-মুরগি পালন শুরু করেন। এভাবে রুপালী বেগম তাঁর মূলধনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আয়কে বহুমুখীকরণ করেছেন। এ থেকেই তাঁর পরিবারে এসেছে সচ্ছলতা। এখন তিনি ৫ শতক জমি এবং পাঁচ লাখ টাকার মালিক। তিনি বিভিন্ন ব্যাংক ও এনজিওতে ডিপিএসসহ সঞ্চয় পত্র খুলেছেন। রুপালী তাঁর ছেলেকে জেলা পুলিশ লাইন স্কুলে ভর্তি করেছেন। রুপালী বেগমের সাফল্য দেখে রেজাউল করিম তাঁকে আবারও বিয়ের প্রস্তাব দেন। রুপালী এখন অনেক সচেতন। তাই তিনি আর রেজাউলের ফাঁদে পা দেননি। বরং এখন তাঁর স্বপ্ন তিনি তাঁর একমাত্র সন্তানকে ভালোভাবে লেখাপড়া করাবেন এবং মানুষের মতো মানুষ করবেন।

২০২১ সালে গাইবান্ধা সদর উপজেলা প্রশাসন নির্যাতনের বিভীষিকা ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করেছে যে নারী এই ক্যাটেগরিতে রুপালীকে জয়িতা বিজয়ী হিসেবে সম্মাননা প্রদান করেন।

নতুন উদ্যমে শুরু শাহিনুরের জীবন

যৌতুক একটা ঘৃণিত বিষয় জানার পরও আমদের সমাজে যৌতুক প্রথা অব্যাহত আছে, যৌতুকের দায় মেটাতে চলছে নানা সংঘাত নানা বিপত্তি। শহর বা গ্রাম সবখানেই সচেতনতা বৃদ্ধির পরও নানা তালবাহানায় নানা উপায়ে চলছে যৌতুক। কেউ উপহার হিসেবে আর কেউ কষ্টে পড়ে নিরুপায় হয়ে দিচ্ছে। আর এই সুযোগে নির্যাতনও চলছে সমাজের ঘরে ঘরে। প্রথমে বিষয়টি নিয়ে গভীর-ভাবে না ভেবেই পাত্র-পাত্রী পক্ষ বিয়েটাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসছে। পরবর্তী-তে চাহিদার মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় হিমশিম খেয়ে এ নিয়ে ঘটছে নানা দুর্ঘটনা। কেউ দুর্ঘটনা এড়িয়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে, আবার কেউ সেই যৌতুকের বলি হয়ে অমানবিক দিন যাপন করছে। যৌতুকের কারণে নির্যাতন আর নির্যাতনকে উপেক্ষা করে নতুন উদ্যোমে জীবন সংগ্রাম শুরু করে সাফল্য এক দৃষ্টান্ত শাহিনুর।

মোছাঃ শাহিনুর খাতুন, পিতা- মোঃ গোলজার হোসেন, মাতা- মোছাঃ পারুল বেগম, গ্রাম- পশ্চিম লখিয়ার পাড়া, ইউনিয়ন- হরিপুর, উপজেলা- সুন্দরগঞ্জ, জেলা- গাইবান্ধা। শাহিনুর নবম শ্রেণির ছাত্রী। লেখাপড়ায় এগিয়ে যাবার ইচ্ছা থাকলেও সংসারের টানাপোড়েনে সেই বয়সেই বাবা-মায়ের মতে বিয়ে করতে হয়। জীবন-যন্ত্রণার শুরুটা সেখান থেকেই। ৭৫,০০০ টাকার যৌতুকের বিনিময়ে বিয়ে করতে হয় শাহিনুরকে। বাবার আর্থিক সংকট থাকায় নগদে ২০,০০০ টাকা পরিশোধ করতে সমর্থ হয়। বিয়ের ২/৩ মাস পর শাহিনুরের স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাঁকে যৌতুকের বাকী টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ দেয়। কিন্তু শাহিনুরের বাবার পক্ষে এতো টাকা অল্প সময়ের মধ্যে দেয়া সম্ভব ছিল না। শাহিনুরের বাবা তাদের কাছে সময় চাইলে তারা সময় দিতে রাজি না হয়ে কিছু কথা শুনিয়ে অপমানও করে। শাহিনুরকে বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। কিছুদিন বাবার বাড়িতে থাকার পর খালি হাতেই স্বামীর বাড়িতে ফেরত আসেন শাহিনুর। কথায় কথায় শ্বশুর বাড়ির মানুষ গালি-গালাজ ও মারধর শুরু করে। এভাবে দিনে দিনে নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকে এবং বিয়ের ৫ মাসের মাথায় অবশেষে তালাক দেয় তাঁকে। তালাকের পর শাহিনুর বাবার বাড়িতে অবস্থান করতে থাকেন। সেখানেও শাহিনুরকে আরও একধাপ মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। বাড়ির বাইরে বের হলেই প্রতিবেশীর নানান গুঞ্জন আর অপবাদের মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। আত্মীয়-স্বজনের নানারকম কথার ছোবলে শাহিনুর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন।

এই অবস্থার মধ্যেই এক পর্যায়ে ঘুরে দাঁড়াবার স্বপ্ন ভর করে শাহিনুরের মনে। তিনি ভাবেন, “অনেকেই তো বাঁচতেছে। নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস নিয়ে চেষ্টা

করে দেখি। নিজের মতো করে নির্যাতনের বিভীষিকা ঝেড়ে ফেলে নতুন করে জীবন সাজানোর কথা চিন্তা করি। নিজেই পরিকল্পনা করি আবার লেখাপড়া শুরু করবো। কিন্তু লেখাপড়ার খরচ চালানোর সামর্থ্য আমার কিংবা বাবার নেই।" এরকম দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতিতে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন টিউশনি করে নিজের পড়াশুনার খরচ চালাবেন শাহিনুর। শুরু হলো নতুন করে পথ চলা। আবার লেখাপড়ায় মনোযোগ দিয়ে এসএসসি, এইচএসসি পাশ করলেন শাহিনুর। এক পর্যায়ে এসকেএস ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ শুরু করেন তিনি। তারপর একে একে বিভিন্ন এনজিওর সাথে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করে আয়-রোজগার বাড়াতে থাকেন। এভাবে নিজের পরিশ্রমে আয় বাড়িয়ে সঞ্চয় করতে থাকেন। অন্যদিকে নিজের খরচ চালিয়েও বাবা-মা'কে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেন শাহিনুর। শাহিনুর বলেন, "খুব অল্প বয়সে বিয়ে করে আমার জীবন-প্রদীপ প্রায় নিভে যেতে বসেছিল। অনেক সময় পার করার পর আমি ঘুরে দাঁড়িয়েছি। আমার মতো কেউ যেন এমন পরিস্থিতির শিকার না হয়।

আমি এখন নিজের জীবনের উদাহরণটিকে সকলের সামনে তুলে ধরে বিভিন্ন উপায়ে মানুষকে সচেতন করার কাজ করে যাচ্ছি। নির্যাতনের করালগ্রাস থেকে বের হয়ে নিজের আত্মবিশ্বাস, পরিশ্রম এবং মানসিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন উদ্যোমে জীবন সাজাতে শুরু করেছি।" এলাকার মানুষের কাছে শাহিনুর জীবনযুদ্ধে একজন সংগ্রামী নারী। দারিদ্র্য, নির্যাতন আর অবহেলাকে জয় করে গ্রামের নারীদের নিয়ে দলীয়ভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে একজন নিবেদিত সমাজকর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। আর তারই স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৯ সালে নির্বাচিত হয়েছেন জয়িতা।

সালেহার স্বপ্নপূরণ

গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়নের পশ্চিম টেংরাকান্দি গ্রামের বাসিন্দা মোঃ ইব্রাহিম মিয়ার স্ত্রী মোছাঃ সালেহা বেগম। সালেহা বেগম ১৯৮৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন একই ইউনিয়নের চরখোলা গ্রামে। ছোটবেলায় সালেহার স্বপ্ন ছিল, তিনি বিএ/এমএ পাশ করে নিজের পায়ে দাঁড়াবেন এবং সমাজের উন্নয়নে কাজ করবেন। কিন্তু ১৯৯৭ সালে ৮ম শ্রেণি পড়া অবস্থায় সালেহার বিয়ে হয়ে গেলে তাঁর সেই স্বপ্ন ভেঙে যায়। তখন গ্রামবাংলায় বিবাহিত অন্যান্য সাধারণ নারীর মতো তাঁরও জীবন চলে ঘর-সংসার করে। বর্তমানে তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে।

বিয়ের ঠিক ১২ বছর পর ২০০৮ সালে সালেহার ভেঙে যাওয়া সেই স্বপ্নের একটা অংশ বাস্তবে রূপ নিতে থাকে। সে বছরই সালেহা একটি সংগঠনের চর লাইভলিহুড প্রোগ্রামে (সিএলপি) পুষ্টি স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন। এরপর ২০১০ সালে সালেহা এসকেএস ফাউন্ডেশনের Resilience through Economic Empowerment, Climate Adaptation, Leadership and Learning (REECALL) প্রকল্পের কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) এর একজন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। সিবিও সদস্য হিসেবে প্রকল্পের অধীনে সালেহা বেগম নারী নেতৃত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পান এবং বিভিন্ন মিটিং ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। মিটিংয়ে অংশগ্রহণ এবং প্রশিক্ষণের সুবাদে সালেহা বেগমের সাথে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের সাথে পরিচয় হয়। প্রশিক্ষণ নিয়ে সালেহা তাঁর এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ করতে শুরু করেন। এভাবে নিজের নেতৃত্ব দানের দক্ষতাকে আরো সংহত করে সালেহা খুব অল্প সময়ের মধ্যে সিবিও-এর সাধারণ সদস্য থেকে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং পরবর্তীতে সেই সিবিও-এর সম্পাদক পদে আসীন হন। এই সময়ে তিনি তাঁর এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে তুলে ধরেন। এলাকার অবহেলিত নারীর পক্ষে ৮ জন দুঃস্থ নারীকে ভিজিডি, ৭ জন নারীকে ভিজিএফ, ৯ জন নারীকে বয়স্ক ভাতা, ১১ জন নারীকে বিধবা ভাতা, ৩ জন দুগ্ধবতী মাকে মাতৃত্বকালীন ভাতা পাইয়ে দিতে সহায়তা করেন। এ ছাড়া এলাকায় নারীদের অধিকার ও সুরক্ষার জন্য অসংখ্য

পারিবারিক কলহের মীমাংসাসহ ৫টি বাল্যবিবাহ রোধ করেছেন। তাঁর এ প্রচেষ্টায় সালেহার গ্রামটি এখন বাল্যবিবাহমুক্ত গ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এখন এলাকার কোনো নারী নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হলে সবাই তাঁর সহায়তা প্রত্যাশা করে। সালেহা বলেন, "যে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনরা আমাকে এতদিন নির্যাতন করতো, তারাও এখন আমার সহায়তা প্রত্যাশা করেন।"

প্রকল্প থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে সালেহা তাঁর নিজের এবং গ্রামের অধিকাংশ মানুষের ঘরবাড়ি উঁচুকরণে সরকারি ও বেসরকারি সহায়তা নিয়ে এসেছেন। এলাকায় বিশুদ্ধ পানির সরবাহের জন্য ৭টি নতুন নলকূপ স্থাপন, ১০টি নষ্ট নলকূপ মেরামত এবং ১২টি হতদরিদ্র পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনে সহায়তা করেন। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে সালেহা শুধু তাঁর নিজের উন্নয়নই করেননি; তিনি সমাজেরও উন্নয়ন করেছেন। শাক-সবজি চাষের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে তাঁর বাড়িকে একটি পুষ্টিবাড়ি হিসেবে যেমন প্রতিষ্ঠিত করেছেন তেমনি তাঁর এলাকার অনেক বাড়িতে সবজি প্রদর্শনী প্লট তৈরিতে কৃষি অধিদপ্তরের সহায়তা এনে দিয়েছেন। তাঁর এই কাজের আগ্রহ দেখে কৃষি অধিদপ্তর প্রতি বছর ৮ থেকে ১০টি কৃষি প্রদর্শনী প্লট তাঁর এলাকায় বরাদ্দ দেয়। সমাজ উন্নয়নে বিশেষকরে কৃষিতে (পুষ্টিবাড়ি) ভূমিকা রাখার জন্য ২০১১ সালের ৯ ডিসেম্বর ফুলছড়ি উপজেলা পরিষদ তাঁকে জয়িতা সম্মাননা প্রদান করেছেন। তাঁর এই প্রাপ্তি তাঁকে আগামী দিনে পথ চলতে অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে সালেহা বেগম মনে করেন। তিনি বলেন, "আমার স্বপ্ন ছিল দুটো, নিজের পায়ে দাঁড়ানো এবং সমাজের সেবা করা। আজ আমার দুটো স্বপ্নই পূরণ হয়েছে। আগামীতে আরো কিছু করতে চাই।"

নতুন জীবনে কোহিনুর বেগম

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার রাখালবুরুজ ইউনিয়নে চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মোছাঃ কোহিনুর বেগম। তাঁর বাবা মোঃ কাইয়ুম হোসেন পেশায় একজন কৃষক এবং মা মোছাঃ দোলেনা বেগম একজন গৃহিণী। এক ভাই ও দুই বোনের মধ্যে কোহিনুর সবার বড়। পরিবারে অভাব থাকলেও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় কোনো কার্পণ্য করেননি তাঁর বাবা। কোহিনুর মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া করে বড় হওয়া। ২০০১ সাল। কোহিনুর তখন নবম শ্রেণির ছাত্রী। বয়স মাত্র ১৪। তাঁর জীবনে দেখা দিল ছন্দ-পতনের পূর্বাভাস। পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা ও সামাজিক নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁর বাব-মা তাঁকে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কোহিনুর বেগম লেখাপড়া শেষ না করে বিয়ে করতে রাজি ছিলেন না। অনেক বার নিজের বিয়ে ঠেকানোর চেষ্টাও করেছিলেন; কিন্তু পারেননি তিনি। পরিবারের প্রবল চাপে ২০০৩ সালে একই ইউনিয়নের কাজীর চক গ্রামের মৃত ছোবাহান আলীর ছেলে মোঃ জিয়াউর রহমানের সাথে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বাধ্য হন কোহিনুর। বিয়েতে তাঁর বাবাকে ৪০ হাজার টাকা নগদ যৌতুকও প্রদান করতে হয়েছিল। দেনমোহর ধার্য হয় ৬০ হাজার টাকা। কিছু দিন ভালোই চলছিল তাদের সংসার।

কোহিনুর বেগমের স্বামীও ছিলেন একজন কৃষক। আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। স্বামীর রোজগার ছিল যেমন কম তেমনি তিনি ছিলেন কিছুটা লোভী প্রকৃতির। বিয়ের ছয় মাস যেতে না যেতেই তাঁর স্বামী তাঁর বাবার কাছ থেকে ১০০,০০০ টাকা নিয়ে আসতে বলেন। কিন্তু বাবার আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে বিষয়টি বাবাকে জানাননি কোহিনুর। এজন্য স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকদের কাছ থেকে তাঁকে অনেক মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। ইতোমধ্যে কোহিনুর দম্পতির ঘরে এক ছেলে ও এক মেয়ের জন্ম হয়। ছেলেমেয়েদের সুখের জন্য নীরবে সব নির্যাতন সহ্য করেন তিনি। সংসার করলেও তাঁর স্বামী তাঁকে মাঝে মাঝে তালাকের হুমকি দিতেন। এভাবে সুখে, দুঃখে ও কষ্টে চলে যায় ৯টি বছর।

এরই মধ্যে ২০১২ সালে কোহিনুর তাঁর ছেলেমেয়েকে নিয়ে একদিন বাবার বাড়িতে বেড়াতে যান। সুযোগসন্ধানী স্বামী ছুঁতো খুঁজতে থাকেন কিভাবে স্ত্রীকে তালাক দেয়া যায়। সে অনুযায়ী বাবার বাড়িতে যাওয়ার তিন দিন যেতে না যেতেই কোহিনুরের স্বামী তাঁকে তালাকের নোটিশ পাঠান। তালাকের নোটিশ পাওয়ার পর স্বামীর সংসারে ফিরে যাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেন তিনি, কিন্তু স্বামীর বাড়ির লোকজন কোনোভাবেই তাঁকে গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। এভাবে নোটিশ পাওয়ার ১৫ দিনের মাথায় যখন স্বামীর বাসায় যান তিনি এবং চতুর স্বামী একটি সালিশ বৈঠকের আয়োজন করেন। গ্রাম্য সালিশে কোহিনুরকে ৮৫,০০০ টাকা প্রদানের শর্তে তাদের তালাক বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়; কিন্তু তিন মাস পার হয়ে গেলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। তাই নিরুপায় হয়ে কোহিনুর আইনের আশ্রয় নেন। আদালতে সন্তানদের ভরণপোষণ ও দেনমোহর আদায়ের জন্য একটি মামলা দায়ের করেন। ছেলের বয়স ১২ বছর হওয়ায় আদালত

বড় ছেলের ভরণপোষণের জন্য ৯৬,০০০ টাকা এবং দুই-সন্তানের ভরনণপোষণ বাবদ প্রতিমাসে ৪,০০০ টাকা করে প্রদানের জন্য আদেশ দেন। কিন্তু তিন কিস্তিতে ৯৬,০০০ টাকা পরিশোধের পর বাকি টাকা দিতে গড়িমসি করেন। এতে কোহিনুর পারিবারিক আদালতে মামলা করলে তাঁর স্বামী আত্মগোপন করেন।

এ ঘটনার পর কোহিনুর ঠিক করেন, তিনি আবার পড়াশোনা শুরু করবেন। দৃঢ় মনোবল এবং সাহস নিয়ে বাবার বাড়ি থেকে পুনরায় স্থানীয় একটি মাধ্যমিক স্কুলে ২০১৬ সালে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন তিনি। নিয়মিত পড়ালেখা করে ২০১৮ সালে মানবিক বিভাগে এসএসসি এবং ২০২১ সালে এইচএসসি পাশ করেন তিনি। বর্তমানে তিনি গাইবান্ধা কলেজে ইসলামের ইতিহাসে বিএ (সম্মান) নিয়ে পড়াশোনা করছেন। নিজের পাশাপাশি তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদেরও পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। ছেলে নবম শ্রেণিতে এবং মেয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে লেখাপড়া করছে।

এরই মধ্যে ২০১৯ সালে তাঁর এলাকায় এসকেএস ফাউন্ডেশনের Action for Socio-economic Security and Rights for Excluded and Marginalized Women and Girls (ASSR for EMWG) প্রকল্প নারীর অধিকার রক্ষা ও ক্ষমতায়ণ নিয়ে কাজ শুরু করলে ১২ এপ্রিল ২০১৯ চাঁদপুর গ্রামে 'টিয়া' মহিলা সমিতি দল গঠন করা হয়। সভাপতি হিসেবে কোহিনুর বেগমকে নির্বাচিত করা হয়। কোহিনুর বেগম উপলব্ধি করতে পারেন, তাঁর নিজের ও ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। তাই তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি এসকেএস ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ASSR for EMWG প্রকল্প থেকে ১৫ দিনের দর্জি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম থেকে ১৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি সেলাই মেশিন ও কিছু কাপড় কিনে বাড়িতে দর্জির কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন মহিলা সমিতি থেকে ১৫ দিনের চটের তৈরি পাপোশ বানানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

বর্তমানে কোহিনুর একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় কাজ করছেন। পাশাপাশি নিয়মিত কাপড় সেলাই এবং হাতের তৈরি বিভিন্ন রকমের ফুল ও পাপোশ বানিয়ে বাড়তি আয় করছেন। এই আয়ের টাকা দিয়ে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ, পরিবারের চাহিদা পূরণ ও কিছু টাকা সঞ্চয় করছেন। এ ছাড়া তিনি বাড়িতে ১০টি হাঁস, ১৮টি মুরগি, ২টি গরু এবং ২টি ছাগল পালন করছেন। এখন তাঁর মাসিক আয় ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা।

কোহিনুর বেগম-এর এই অদম্য প্রচেষ্টা এবং সফলতাকে কেন্দ্র করে ২০২১ সালে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা পর্যায়ে তিনি জয়িতা সম্মাননা অর্জন করেন। এ সম্মাননা তাঁকে আরও আত্মবিশ্বাসী করেছে। কোহিনুর বলেন, 'শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থার উন্নয়ন না হলে নারীর প্রতি সহিংসতা কমবে না। তাই শিক্ষাকে সবার উপরে গুরুত্ব দিতে হবে।'

অর্থনৈতিক সাফল্যে বুলবুলি বেগম জয়িতা

মোছাঃ বুলবুলি বেগম গ্রাম ধানগড়া, মুক্তিনগর, সাঘাটা, গাইবান্ধা জেলার বাসিন্দা। বুলবুলির বাবা পেশায় ছিলেন একজন দিনমজুর। তিনি অন্যের জমিতে কাজ করে কোনোরকমে সংসার চালাতেন। অভাবের সংসারে মেয়েকে লেখাপড়া করাতে পারেননি। মেয়ে বড় হচ্ছে– এ নিয়ে যেন প্রতিবেশীদের আলোচনার শেষ নেই। মাঝেমধ্যে অনেকেই নানা উসকানিমূলক অমর্যাদাকর কথা বলতে থাকে বুলবুলির বাবাকে। বাধ্য হয়ে বুলবুলির বাবা ১৯৯৪ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেন একই গ্রামের মোঃ ইয়াদ আলীর সাথে। ইয়াদ আলী ছিল পূর্ববিবাহিত এবং পেশায় একজন দিনমজুর। যৌতুক ছাড়া বিয়ে হওয়ার কারণে বুলবুলির পরিবার থেকে ইয়াদ আলী সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজখবর নেয়নি। বিয়ে হওয়ার পর কিছুদিন স্বামীর সংসারে ভালোই ছিল বুলবুলি। আস্তে আস্তে ইয়াদ আলীর স্বভাব ও সকল গোপন কথা প্রকাশ হতে থাকে; সে অলস, বিবাহিত, আগের পক্ষের সন্তান আছে, বসতবাড়িটাও অন্যের জায়গায়, ইত্যাদি। ইয়াদ আলী একদিন কাজ করলে বাকি দুই দিন বাড়িতে বসেই দিন কাটায়। এগুলো যখন বুলবুলি বুঝতে পারেন, তখন স্বামীকে পরিশ্রম করার জন্য চাপ দেন। আর তখন থেকেই শুরু হয় তাদের মধ্যে কারণে-অকারণে ঝগড়া-বিবাদ। প্রতিবাদ বা উচ্চবাচ্য করলেই বুলবুলিকে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। বিয়ের দীর্ঘদিন পার হলেও তাদের পরিবারে কোনো সন্তানের জন্ম হয় না। সন্তান না হওয়ার দায়ভারও এসে পড়ে বুলবুলির ওপর। আর এই কারণে বুলবুলিকে পরিবার এবং সমাজের মানুষের কাছ থেকে নানা বাজে কথা শুনতে হয়। অনেক কষ্ট করে খেয়ে না খেয়ে চলতে থাকে বুলবুলির জীবন।

বুলবুলি মনে মনে ভাবেন, এভাবে তো আর জীবন চলতে পারে না। তাঁকে বাঁচতে হবে; নিজেকে কিছু একটা করতে হবে। সেই ভাবনা থেকেই বুলবুলি বিভিন্ন মানুষের সাথে যোগাযোগ করে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ খুঁজতে থাকেন। ক্ষুধার জ্বালা কাউকে বলতেও পারেন না আবার সহ্যও করতে পারেন না। অবশেষে বুলবুলি একদিন অন্যের একটি চাতালে কাজ শুরু করেন। স্বামী বুলবুলির কাজে বাধা দিলেও বুলবুলি মানেননি। প্রতিদিন চাতালে কাজের মজুরি পান ২০০ টাকা। দুজনের খাবার ক্রয় এবং সংসারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ মেটানোর পাশাপাশি কিছু সঞ্চয়ও করতে থাকেন বুলবুলি। এভাবেই চলছিল বুলবুলির সংসার।

২০১৯ সালের শুরুর দিকে হঠাৎ একদিন হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান বুলবুলির স্বামী ইয়াদ আলী। বুলবুলির জীবনে নেমে আসে নতুন আরেক ঝড়।

স্বামী নেই, বাস্তুভিটা নেই– কিভাবে থাকবেন স্বামীর এলাকায়? মা-বাবাও গত হয়েছে অনেক আগেই। বুলবুলি এখন কোথায় যাবেন? তার এই দুঃসময়ে কে তাঁকে সহযোগিতা করবে– এসব চিন্তাই তাঁর নিত্যসঙ্গী। এমন সময় এলাকার কিছু সাহসী নারী তাঁকে সাহস দেন, নানা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন এবং তাঁকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। বুলবুলি আশার আলো দেখতে পান, আবার ঘুরে দাঁড়ান। এলাকার ঐ নারীদের পরামর্শ অনুযায়ী ২০১৯ সালের মার্চ মাসে এসকেএস ফাউণ্ডেশনের Action for Socio-economic Security and Rights for Excluded and Marginalized Women and Girls (ASSR for EMWG) প্রকল্পের সদস্য হন বুলবুলি। প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন সচেতনতামূলক সেশনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। জমানো সামান্য পুঁজি থেকে বাজারের পাশেই একটা ছোট্ট দোকানঘর ৫০০ টাকায় ভাড়া নেন এবং সেখানে পান-সুপারি এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী বিক্রি করতে থাকেন। প্রতিদিন গড়ে ৮০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করে প্রায় ২০০ টাকা লাভ করেন; যা দিয়ে তাঁর জীবন বেশ ভালোভাবেই কেটে যাচ্ছিল। ২০২০-এর প্রথম দিকে করোনার কারণে বুলবুলির দোকান বন্ধ হয়ে গেলে, এসকেএস ফাউণ্ডেশনের ASSR for EMWএ প্রকল্পের নগদ অর্থ সহায়তা তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি ঐ প্রকল্প থেকে মোট ৭,৫০০ টাকা বরাদ্দ পান এবং তা দিয়ে পুনরায় দোকান চালু করেন। দোকানের আয়ে সচল হয় বুলবুরির সংসার, ফিরে পান প্রাণ। এভাবেই বুলবুলি নিজের জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে হতে থাকেন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী।

এক পর্যায়ে বুলবুলি তাঁর সঞ্চয় থেকে ১৫,০০০ টাকা দিয়ে এক শতক জমি ক্রয় করেন। ২০,০০০ টাকা খরচ করে তৈরি করেছেন একটি টিনের ঘর। বাড়িতে পালন করছেন ১,৮০০ টাকা দিয়ে কেনা ৬টি হাঁস এবং ৯০০ টাকা দিয়ে কেনা ৩টি মুরগি। তাঁর সঞ্চয় আছে ৩০,০০০ টাকা; যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিকল্পনা আছে, বাজারেই নিজের নামে একটা দোকান ক্রয় করবেন এবং তার দোকানকে একটি বড় ব্যবসায়িক স্থাপনা হিসেবে দাঁড় করাবেন। যেন অন্যান্য নারীরা তাঁকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়। তারা যেন আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে চলতে পারে। সাঘাটা উপজেলা প্রশাসন বুলবুলির এই সংগ্রামী আর লড়াকু জীবন-কাহিনি যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে বুলবুলিকে ২০২০ সালে জয়িতা পুরস্কারে ভূষিত করেন এবং ৯ ডিসেম্বর ২০২০ তাঁর হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

সমাজ উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতি পেলেন লাইলী

গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়েনের পূর্ব কাতলামারী গ্রামের আজিমুদ্দিন ও হাফছা বেগম দম্পতির মেয়ে মোছাঃ লাইলী বেগমের জন্ম ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে। লাইলী-দের পরিবার ছিল অনেক বড়, ৪ ভাই ও ৬ বোন। ভাই-বোনদের মধ্যে লাইলী নবম। বাবার আর্থিক অবস্থাও তেমন ভালো ছিল না। তাই লাইলীর বাবা ১৯৮৬ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে লাইলীর বিবাহ দেন একই ইউনিয়নের রতনপুর গ্রামের বাসিন্দা রাজা মিয়ার সাথে। লাইলীর স্বামীর পরিবারও অনেক বড়। ৭ ভাই-বোন। তার শ্বশুরের আর্থিক অবস্থাও খুব ভাল ছিল না, সে কারণে তাঁর স্বামী জীবন নির্বাহের তাগিদে পূর্ব কাতলামারী গ্রামে আসেন।

মনে অনেক স্বপ্ন ছিল, বড় হয়ে পড়াশোনা করে চাকুরি করবেন, গ্রামের মানুষের কল্যাণে কাজ করবেন। কিন্ত সে আশা পূরণ হয়নি লাইলীর। তাঁর আশার আলোয় পানি ঢেলে দেন তাঁরই বাবা শুধুমাত্র অভাবের ঠুনকো অজুহাতে। বিয়েতে তাঁর কোন মত ছিল না। অনেক কান্না-কাটি করেছিল লাইলী; তার এই কান্না তার পাষাণ বাবার মন গলাতে পারেনি। সে সময় এত সচেতনতাও ছিল না। আর বাবা মাকেও বড্ড ভালবাসতেন তিনি। অগত্যা বাবা-মায়ের প্রতি ভালবাসার কারণে প্রতিবাদ করেননি, বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন লাইলী। স্বামী দিনমুজুরের কাজ করতেন। বিয়ের পর তাঁর স্বামী তাকে বাইরে যেতে দিতেন না। এমনকি পাশের বাড়িতে ঝগড়া-ঝাটি হলেও না। বয়স কম হওয়ায় অনেক সময় নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারতেন না। কৌতুহলী মনের কারণে অনেক সময় গোপনে পাশের বাড়িতে যেতেন লাইলী, এজন্য তাঁকে অনেক বকঝকা এমনকি মারও খেতে হতো। এভাবেই সংসারের কাজকর্ম করে কয়েক বছর সংসার করেন তিনি। বিয়ের ছয় বছর পর প্রথম ছেলের জন্ম হয় এবং এর এক বছর পর আরও এক ছেলের জন্ম তাঁর। চারজনের সংসার। অভাব যেন আরও বাড়তে থাকে।

বড় ছেলে (১৪) যখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়তো, সংসারে অভাবের কারণে পড়াশুনার পাশাপাশি মাঝে মাঝে ঢাকায় রাজমিস্ত্রির লেবার হিসেবে কাজ করতে যেত সে। স্কুল বন্ধ হলেই ঢাকায় গিয়ে কাজ করে বেশ টাকা আয় করে আনতো। কষ্ট হলেও দিনকাল ভালই চলছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ছেলে ঢাকায় কাজ করতে গিয়ে ৫ম তলা থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। ছেলের শোকে লাইলী পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন, সবসময় অন্যমনষ্ক থাকতেন। কিছুদিন ডাক্তারের চিকিৎসাধীনও ছিলেন। একদিন ডাক্তার তার স্বামীকে পরামর্শ দেন, স্ত্রীকে সুস্থ করতে হলে সবসময় মানুষের মধ্যে থাকতে হবে, হাসি-খুশি রাখতে হবে। না হলে তাঁকে সুস্থ করা কঠিন হবে। বিষয়টি তাঁর স্বামী বুঝতে পারেন। তারপর থেকে লাইলীকে আশেপাশের লোকজনের সাথে মিশতে দেন,

আত্মীয় স্বজনদের সাথে মিশতে দেন। লাইলীও ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যুটাকে ভুলে থাকার জন্য গ্রামের মানুষের সাথে মিশতে থাকেন, মানুষের সমস্যায় এগিয়ে যান। কেউ বিপদে পড়লে নিজের সামর্থ্য না থাকলেও অন্যদের থেকে সহযোগিতা নিয়ে বিপদগ্রস্থকে সহযোগিতা করেন। এভাবে সালিশ মীমাংসায়ও অংশগ্রহণ করেন লাইলী।

২০১৬ সালে এসকেএস ফাউন্ডেশন সৌহার্দ্য-৩ কর্মসূচি শুরু করলে তিনি প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেন এবং গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। পাশাপাশি তিনি 'একতা' নারীদলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। একতা সেন্টারে মূলত নারী ও কিশোরীদের উন্নয়ন, নারীদের ক্ষমতায়ণ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকে, বিভিন্ন ধরণের সেশন পরিচালিত হয়ে থাকে। সেখানে তিনি জানতে পারেন, মেয়েরাও ইচ্ছে করলে অনেক কাজ করতে পারে। লাইলীর মনে তখন ছোট বেলার সেই অব্যক্ত ইচ্ছাগুলো আবার উঁকি দিতে শুরু করে। মনে মনে ভাবেন, তাঁর ছোটবেলার ইচ্ছাগুলো হয়তো পূরণ করতে পারবেন।

বিভিন্ন মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করে নারীর ক্ষমতায়ণ, নারীর অধিকার এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে ভালভাবে জানতে পারেন তিনি। গ্রাম উন্নয়ন কমিটির একজন সদস্য হিসেবে প্রতিনিয়ত গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান, বিভিন্ন সালিশ মিমাংসায় অংশগ্রহণ করে পারিবারিক কলহ নিরসনে ভূমিকা রাখেন লাইলী। গ্রামের ছোট ছোট রাস্তা-ঘাট ভেঙে গেলে সকলকে সাথে নিয়ে মেরামত করেন এবং যেগুলো স্থানীয়ভাবে সম্ভব হয় না, সেগুলোর জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সাথে যোগাযোগ করেন তিনি। এছাড়াও গ্রামের মা ও শিশুদের সুস্বাস্থের জন্যও কাজ করেন। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের নিরাপদে সন্তান প্রসব এবং শিশু স্বাস্থ্য রক্ষায় কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে যোগাযোগ করে দেন লাইলী। পাশাপাশি গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরিচর্যায় সচেতনতা তৈরির জন্য শ্বশুর ও শাশুড়িদের সাথে কথা বলেন।

গ্রামের অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের বিভিন্ন ভাতা পাওয়ার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ মেম্বারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বয়স্কভাতা, বিধবাভাতাসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রাপ্তিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শীতের সময় এলাকায় কর্মরত এনজিও ও সরকারি সেবাপ্রদানকারীদের সহায়তায় শীতবস্ত্রের ব্যবস্থা করেন। বন্যার সময় নারীদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন করেন লাইলী। এলাকার ঝরে পড়া কিশোর-কিশোরীদের লেখাপড়ার ব্যাপারে

অভিভাবকদেরকে উৎসাহিত করেন; ইতোমধ্যে ৭জন ঝরে পড়া কিশোরীকে পুনরায় স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন তিনি। চেয়ারম্যানের সহায়তায় ৪টি রোধ করেছেন। এ ব্যাপারে তার স্বামী ও পরিবারসহ গ্রামের অনেক মানুষ তাঁকে সহযোগিতা করছেন। নারী-পুরুষ তাঁকে সার্বিকভাবে উৎসাহ প্রদান করে আসছেন। কাজ করতে গিয়ে কেউ কেউ সমালোচনা করলেও উৎসাহ ও সহযোগিতাটা বেশি পান তিনি। তিনি ইউনিয়ন পরিষদের ৫০টি ল্যাট্রিন ও ২০টি নলকূপ পেতে সহায়তা করেছেন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করেছেন ৪টি, পারিবারিক কলহ নিরসন ১৫টি, বহুবিবাহ প্রতিরোধ ৩টি, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রাপ্তিতে সহায়তা ১৮টি, বিধবা ভাতা প্রাপ্তিতে সহায়তা ১২টি, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তিতে সহায়তা ৫টি এবং ২০টি পরিবারকে বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছেন।

এলাকার লোকজন বিশেষ করে নারীরা সকল কাজে তাঁর সহযোগিতা চায়, সবাই তাঁকে মূল্যায়ন করে, জনদরদী নেত্রী বলে ডাকে। তিনি বলেন, "যখন কেউ কোন কাজে সহযোগিতা চায় তখন নিজের খুব ভাল লাগে। এখন আমার আন্তরিক ইচ্ছা, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবায় নিজেকে যেন নিয়োজিত রাখতে পারি। নারীরাও যেন সমাজ উন্নয়নে কাজ করতে পারে, এজন্য চাই নিজের আত্মবিশ্বাস ও সকলের সহযোগিতা। আমার জন্য সকলে দোয়া করবেন যাতে সুস্থ থেকে সকলের কাজে লাগতে পারি।"

সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছে যে নারী এই ক্যাটাগরিতে ২০২১ সালের ৯ ডিসেম্বর ফুলছড়ি উপজেলা প্রশাসন লাইলীকে জয়িতা হিসেবে সম্মাননা প্রদান করেন।

এসকেএস ফাউন্ডেশন
কলেজ রোড, উত্তর হরিণ সিংহা, গাইবান্ধা-৫৭০০, বাংলাদেশ
+৮৮-০২৫৮৮৮৭৭৬৩০ +৮৮-০২৫৮৮৮৭৭৬৩১ +৮৮০ ১৭১৩ ৪৮৪৪৩০
sksfoundation@sks-bd.org, sksfoundation.bd@gmail.com

ঢাকা অফিস:
জয়েন্ট ভিউ টাওয়ার (ফোর্থ ফ্লোর), ১৩০০, কলেজ রোড,
আশকোনা, দক্ষিণখান, ঢাকা-১২৩০.
+৮৮০ ১৭১৩ ৪৮৪৪৮৫

www.sks-bd.org sksfoundation sksfoundationbd sks.foundation